

## নজরুল কথাসাহিত্য : ভাষা বিন্যাসের নবদিগন্ত

সুজিত সরকার

### ১. প্রস্তাবনা

ভাষা হচ্ছে আত্মপ্রকাশের অন্যতম বাহন। মানুষ মুখের এবং লেখার ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করে। সাহিত্য লেখার ভাষাতেই প্রকাশিত হয়। লেখক নিজের, বহির্জগতের এবং অন্যের কথা স্বকল্পনায় লেখার ভাষায় প্রকাশ করেন। প্রকাশের সে ভাষা ব্যক্তি ও বিষয়ানুসারে এবং কালের ব্যবধানে হয় স্বতন্ত্র, তা সচেতন পাঠকমাত্রই অবহিত। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) - এর কথাসাহিত্যের ভাষা যে সেই স্বাতন্ত্র্যেরই পরিচয় বহন করছে এবং কেনো, আর কি সে স্বাতন্ত্র্য-মুখ্যত সেটাই এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য।

### ২. নজরুল কথাসাহিত্যঃ প্রকাশকাল ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ

বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের পরিচয় প্রধানত কবি হিসেবে। অথচ তাঁর প্রকাশিত প্রথম রচনা 'বাউড়েলের আত্মকাহিনী' কিস্তি একটি গল্প। গল্পটি ১৩২৬ এ মাসিক সওগাত-এর জ্যৈষ্ঠ মাসে ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এর পরে ত্রৈমাসিক 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র শ্রাবণ (জুলাই-আগস্ট) ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যায় 'মুক্তি' নামক তাঁর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। করাচি সেনানিবাস থেকে এই গল্প ও কবিতাটি তিনি পত্রিকায় পাঠান। ওই একই বছরে সওগাতে ভদ্র-আশ্বিন এবং কার্তিক মাসে তার 'স্বামী হারা' গল্প, 'কবিতা সমাধি' কবিতা এবং 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' শিরোনামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে তাঁর সম্পর্কে সাহিত্য প্রেমীরা কৌতূহলী হয়ে উঠেন। নজরুল ইসলাম বিশ্বযুদ্ধ পর কলকাতায় এলে বামপন্থী রাজনীতিবিদ মোজাফফর আহমেদের (১৯৮৯-১৯৭৩) সহযোগিতা আর বন্ধুত্ব লাভ করেন। বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ও (১৯০১-১৯৭৬) এ-সময় কলকাতায়। এদের সান্নিধ্যে এসে নজরুল একের পর এক গান-কবিতা আর গল্প রচনার পাশাপাশি পত্রিকা সম্পাদনা এবং সাহসী সম্পাদকীয় লেখা শুরু করেন।

তবুও তাঁর গান ও কবিতার তুলনায় গদ্য রচনার সংখ্যা কম। তিনি মোট উনিশটি গল্প রচনা করেছেন-যেগুলোর মধ্যে আঠারটি পরে 'ব্যথার দান' (ফাল্গুন-১৩২৮), 'রক্তের বেদন' (পৌষ-১৩৩১), ও 'শিউলিমালা' (আশ্বিন-১৩৩৪) নামে তিনটি গল্প গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসও তিনটি-বাঁধনহারা' (শ্রাবণ-১৩৩৪), 'মৃত্যুসুধা' (ফাল্গুন-১৩৩৬), ও 'কুহেলিকা' (শ্রাবণ-১৩৩৮)। একমাত্র 'বনের পাপিয়া' নামক গল্পটি কোনো গল্প গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। নজরুল ইসলামের গল্প এবং উপন্যাসত্রয় সে সময় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং গ্রন্থাকারে বিভিন্ন প্রকাশক সেগুলো পরে প্রকাশ করেন।

## সাহিত্যিকী

‘বাঁধন-হারা’ উপন্যাসটি ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে কলকাতার ডি.এম. লাইব্রেরী গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। তার আগে ‘মোসলেম ভারত’-এর বৈশাখ (প্রথম সংখ্যা) থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি ‘পত্রোপন্যাস’ হিসেবে পরিচিত। অনেকে<sup>১</sup> দাবি করেছেন, ‘বাঁধন হারা’ বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, নজরুলের বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ও ‘ক্রৌঞ্চ-মিথুন’ নামে একখানি পত্রোপন্যাস রচনা করেন। ‘মৃত্যুক্ষুধা’ নজরুলের দ্বিতীয় উপন্যাস। ‘সওগাত’-এর অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ থেকে মাঘ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ‘কুহেলিকা’ নওরোজ (আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৩৪) ও সওগাত-এ (পৌষ-মাঘ ১৩৩৫) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

‘ব্যথার দান’ গল্পগ্রন্থে প্রথমে মোট পাঁচটি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়। মোসলেম ভারত পত্রিকার মালিক আফজালুল হক ১৩২৮-এ কবির আর্থিক অনটনের সুযোগ নিয়ে গ্রন্থস্বত্ব মাত্র একশো টাকায় ক্রয় করলে ‘রাজবন্দীর চিঠি’ নামক একটি গল্প লিখে গ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত করলে ব্যথার দান গ্রন্থে গল্পের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয়টি। ‘ব্যথার দান’ই নজরুলের প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত পুস্তক।<sup>২</sup>

এই গ্রন্থের ‘হেনা’, (কার্তিক-১৩২৬) ‘ব্যথার দান’, (মাঘ-১৩২৬) ‘অতৃপ্ত বানানা’, (শ্রাবণ-১৩২৭) গল্পত্রয় ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা’য় প্রকাশিত হয়। ‘ঘুমের ঘোরে’ (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৬) ‘নূর’, ‘বাদল-বরিষণ’ (শ্রাবণ-১৩২৭) এ ‘মোসলেম ভারত’ এবং ‘রাজবন্দীর চিঠি’ (মাঘ-১৩২৭) ‘সওগাত’-এ প্রথম প্রকাশিত হয়।

‘রিক্তের বেদন’ গ্রন্থে আটটি গল্প সংকলিত হয়। তন্মধ্যে সাপ্তাহিক ‘সওগাত’-এ ‘বাউভেলের আত্মকাহিনী’ (জ্যৈষ্ঠ-১৩২৬), ‘স্বামীহারা’ (ভাদ্র-১৩২৬), ‘রাস্কুসী’ (মাঘ-১৩২৭), ‘নূর’-এ ‘মেহের-নেগার’ (মাঘ-১৩২৬), ‘রিক্তের বেদন’ (বৈশাখ-১৩২৭), ‘দুরন্ত-পথিক’ দৈনিক নবযুগ (আশ্বিন-১৩২৭), পরে আশ্বিন মাসে ‘মোসলেম ভারত’-এ সংকলিত হয়, ‘সাঁঝের তারা’ ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা’ (মাঘ-১৩২৭), ‘সালেক’ (আষাঢ়-১৩২৭) (বকুল) পত্রিকায় ‘সালিক’ শিরোনামে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা প্রকাশ করে। ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স ১৯২১-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে নজরুলের ‘রিক্তের বেদন’-এর গ্রন্থস্বত্ব কিনে মাত্র চারশো টাকায়।

### নজরুল কথাসাহিত্য : ভাষা বিন্যাসের নবদিগন্ত

শিউলিমলা গল্পগ্রন্থে চারটি গল্প স্থান পায়। সেগুলোর মধ্যে ‘সওগাত’-এ ‘অগ্নিগিরি’ (আষাঢ়-১৩৩৭), ‘পদ্ম-গোখরো’ (জ্যৈষ্ঠ-১৩২৬), ‘শিউলিমলা’ (শ্রাবণ-১৩৩৭); আর ‘মোসলেম ভারত’-এ ‘জিনের বাদশা’ (আশ্বিন-১৩২৭) প্রকাশিত হয়।

#### ৩. স্বমহিমায় নজরুল : অভিমানী আর আত্মমুগ্ধ নায়কের ভাষা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ‘নজরুল ইসলামের গদ্যরচনা’ প্রবন্ধে বলেছেন, ‘নজরুল ইসলাম তাঁর গদ্যরচনায় স্পষ্ট করেই অভিমানী’।<sup>৭</sup> তিনি একই প্রবন্ধে আরো বলেছেন, ‘একই সঙ্গে তিনি গর্বিত ও দুঃখিত, বিত্তবান ও নির্ধন। সে-বস্তু তাঁর আত্মপ্রেম। নজরুলের গল্প-উপন্যাসে নায়ক একজনই নজরুল নিজে। এই আত্মমুগ্ধ নায়ক নিজের জগৎ মনের মত করে তৈরী করে, তারপর সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়-রাজার মত। সে আছে তাই অন্যেরা আছে। তার সৌরলোকে অন্যেরা গ্রহ-উপগ্রহ।’<sup>৮</sup>

নজরুলের গদ্যরচনা সম্পর্কে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে অর্থবহ। শুধু কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, অনেক প্রবন্ধেও নজরুল নৈব্যক্তিক থাকতে পারেননি। ব্যক্তি নজরুলের আবেগ-উচ্ছ্বাস সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর বর্ণনা-বিশ্লেষণে এমন কি সংলাপেও যুক্তির চেয়ে ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাসের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। তাঁর কবিতায়ও সেই ভাবোচ্ছ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে। সাহিত্যে এই ব্যক্তিনিষ্ঠতা শিল্পগুণ ক্ষুণ্ণ করে। তাঁর ‘বাঁধন-হারা’র নূরুল হুদা ‘কুহেলিকা’র জাহাঙ্গীর এবং ‘মৃত্যু-ক্ষুধা’র আনসার আসলে নজরুলেরই প্রতিকৃতি।<sup>৯</sup> ‘নূর’ নজরুল ইসলামের বাল্যকালের ডাক নাম ছিল। ‘বাঁধন হারা’র প্রধান পাত্র লেখকও নূর। সুতরাং সেটা যে নজরুলের প্রতিকৃতি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

‘কুহেলিকা’ উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আব্দুল হক বলেছেন, ‘সাহিত্যের ইতিহাস বিচারে এরূপ কৃতিত্বের মূল্য আছে যথেষ্ট কিন্তু শিল্পমূল্যের প্রশ্নটাই বড়। ‘কুহেলিকা’র শিল্পমূল্য বেশী নয়।’<sup>১০</sup> এর কারণ ব্যাখ্যায় তিনি উল্লেখ করেছেন, ‘তার অতিমাত্রিক ভাবালুতাঃ যা নজরুল ইসলামের সর্বব্যাপী দোষ, অবিচ্ছেদ্য স্বলন’।<sup>১১</sup>

‘ব্যথার দান’ গল্পে দারার আত্মকথনের মধ্যে দিয়ে নজরুল নিজের কথা, তাঁর সৈনিক ও প্রেমিক মনের কথা যেমন বলেছেন-

আমি ‘অফিসার’ হয়ে ‘সর্দার বাহাদুর’ খেতাব পেলাম। সাহেব আমাকে কিছুতেই ছাড়বেনা। হায়, কে বুঝবে আর কা’কেই বা বোঝাবে, ওগো আমি বাঁধন কিনতে আসিনি। সিঁদুপারে কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েও যাইনি। ও শুধু নিজেকে পুড়িয়ে খাঁটি ক’রে নিতে-নিজেকে চাপা দিতে।<sup>১২</sup>

‘বাঁধন-হারা’ উপন্যাসে সৈনিক নূরুল হুদার বয়ানেও এই একইভাবে আত্মপ্রকাশের দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই।

## সাহিত্যিকী

আজকাল খুব বেশী প্যারেড ক'রতে হচ্ছে। দু'দিন পরেই আহুতি দিতে হবে কিনা। আমি পুনা থেকে বেয়নেট গুরু পাশ ক'রে এসেছি। এখন যদি তোমায় আমার এই শক্ত মাংস পেশীগুলো দেখাতে পারতাম।

দেখেছ, সামরিক বিভাগের কি সুন্দর চটক কাজ? এখানে কথায় কথায় প্রত্যেক কাজে হাবিশদারজীরা হাঁক পাড়ছেন, 'বিজলী বা মাফিক চটক হও;-শাবাশ জোয়ান!'

এখন আসি। 'রোল কলের' অর্থাৎ কিনা হাজিরা দেবার সময় হ'ল। হাজিরা দিয়ে এসে বেস্ট, ব্যাডোনিয়ার কুট, পট্রি (এ সব হ'চ্ছে আমাদের রণসাজের নাম) দস্তুর মত সাফ-সুতরো ক'রে রাখতে হবে। কাল প্রাতে দশ মাইল 'কুট মার্চ' বা পায় হটন।''

নজরুল কথাসাহিত্য থেকে এই দু'টো উদাহরণই বোধহয় উপরিউক্ত বক্তব্যের সমর্থনে যথেষ্ট। তিনি 'অভিমানী' ও 'আত্মমুগ্ধ নায়ক' নিজেই যার প্রত্যেকটি ঘটনায় সরবে উপস্থিত, এ-কথা তাঁর রচিত ভাষাই সাক্ষ্য দিচ্ছে। আবেগ অভিমান আর আত্মপ্রকাশের নিখাদ ব্যক্তিগত ভাবাবেগ নজরুল কথাসাহিত্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রায় সব গল্পে ও উপন্যাসে এ দৃষ্টান্ত খুব সুলভ। এ বক্তব্যের সমর্থনে আর দু'একটা উদাহরণ এখানে দেয়া যায়।

আমি যদি না-ই ফিরি, দুঃখ করিসনে ভাই। আমরা তো ফেরার সম্বল নিয়ে বেরোইনি। তাই ফেরারি আসামী হয়েই কাটিয়ে দিলাম। আমাদেরই গধের পথিক যারা রয়ে গেল-তাদের মাঝেই আমরা দেখতে পাবি। এই কারায়, এই ফাঁসি মধ্যে আমরা তো আজই এসে দাঁড়াইনি, আমাদের কণ্ঠে শতজননের শত লাঞ্ছনার রক্ত লেখা হয়ত আজো মুছে যায়নি। নইলে এমন সুখের নীড়ে আমার মন বসল না কেন? পিঞ্জরের দ্বার ভেঙ্গে মুক্ত লোকের উর্ধ্ব উড়ে গান গাওয়ার এ সাধ কেন জাগল? জীবনকে আমরা জীবিতের মতই ব্যয় করে গেলাম, মৃতের মত কার্পণ্য করে কাক-শবুনের খাদ্য করিনি। আমার যা সম্ভবনা, তা যেন কোন দিন তোর অগৌরবের না হয়ে ওঠে।''

'রিক্তের বেদন' গল্পেও আত্মকথনের ভঙ্গি পূর্ববৎ-

আঃ! একি অভাবনীয় নতুন দৃশ্য দেখ্লাম আজ? জননী জনাত্মির মঙ্গলের জন্যে সে-কোন-অনেকা দেশের আগুনে প্রাণ আহুতি দিতে একি অগাধ অসীম উৎসাহ নিয়ে ছুটেছে তরুণ বাঙালীরা, আমার ভাইরা থাকি পোষাকের মান আবরণে এ কোন আগুনভরা প্রাণ চাপা রয়েছে! তাদের গলায় হাজার ফুলের মালা দোল খাচ্ছে, ওগুলো আমাদের মায়ের দেওয়া ভাবী-বিজয়ের আশিসমাল্য, বোনের দেওয়া মেহ-বিজড়িত অশ্রুর গৌরবোজ্জ্বল কমহার।''

নজরুলের এই অভিমান, আত্মকথনের ভাষা এতোটা প্রবল যে, এর ফলে গল্পগুলো বা উপন্যাসগুলো সমহিমায় অথবা বলা যায় নৈব্যক্তিকভাবে উদ্ভীর্ণ হতে পারেনি। সব বক্তব্য এক কেন্দ্রে এসে আটকে গেছে, যাকে আবেগোক্তান্ত আত্মকথন বলা যায়।

## নজরুল কথাসাহিত্য : ভাষা বিন্যাসের নবদিগন্ত

আমার আজ দুনিয়ার কারুর ওপর অভিমান নেই। আমার সমস্ত মান-অভিমান এখন তোমারই ওপর খোদ! তুমিই তো আমায় এমন ক'রে রিক্ত করেছে, তুমিই যে আমার সমস্ত স্নেহের আশ্রয়কে ঝ'ড়ো-হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে সারা বিশ্বকে আমার ঘর ক'রে তুলেছ, -এখন পর হ'লে চ'লবে না-এড়িয়ে যেতেও পারবেনা। এখন তুমি না সইলে এ দুরন্তের আদার অত্যাচার বে-সইবে বল? ওগো আমার দুর্জয় মঙ্গলময় প্রভু, এখন তুমিই আমার সব।<sup>১৫</sup>

এখানেও আজহারের কথার মধ্যে নজরুলের প্রেমিক হৃদয়ের আবেগময় শব্দাবলী পরিবেশিত হয়েছে। এই অরোধ্য আবেগ অনেকটা 'চেতনাপ্রবাহ'র প্রলাপমাখা ভাষা বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিতবহ। 'রাজবন্দীর চিঠি' গল্পটির শুরু আবেগজড়িত ভাষা দিয়ে। তা কারো কাছে অসংলগ্ন মনে হলেও আমাদের স্বীকার করতে দ্বিধা থাকা উচিত নয় যে, নজরুল ইসলামের কথাসাহিত্যের ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আবেগ। এ-ভাবেই তিনি ভাব প্রকাশ করতে হয়তো স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন।

আজ আমার বিদায় নেবার দিন। একে একে সবলেরই কাছে বিদায় নিয়েছি। তুমিই বাকী। ইচ্ছা ছিল, যাবার দিনে তোমায় আর ব্যথা দিয়ে যাব না, কিন্তু আমার যে কিছুই বলা হয়নি। তাই ব্যথা পাবে তেনেও নিজের এই উচ্ছ্বল বৃত্তিটাকে কিছুতেই দমন ক'রতে পারলুম না। তাতে কিন্তু আমার দোষ দিতে পারবে না, কেননা তোমার মনে তো চিরদিনই গভীর বিশ্বাস যে, 'আমার মতন এত বড় স্বার্থপর হিংসুটে দুনিয়ায় আর দু'টি নেই।'<sup>১৬</sup>

### ৪. আত্মবিধ্বংসী আবেগের শব্দচয়ন

অনেকেই মনে করেন, কবি মাত্রেরই আবেগপ্রবণ। কিন্তু সে আবেগ যদি যুক্তি ও বাস্তবতার মাত্রা অতিক্রম করে এবং কেবলমাত্র নিজের মান অভিমান প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যাঙিলাভ করে, তাহলে সেরকম রচনায় শিল্পগুণ অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়, সে কথাও বারো অজানা নয়। নজরুল কথাসাহিত্যে শুধু নয়, কবিতার ক্ষেত্রেও এ বক্তব্য অনেকখানি সত্য। বক্তব্যের সংযম আর পরিমিতিবোধ, সার্থক কথাসাহিত্যের অন্যতম উপাদান। নজরুলের সে বোধের ধারা ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশের উৎসারিত হয়েছে। তাই, যে নারীকে তিনি মায়ের উচ্চাসনে বসিয়ে শ্রদ্ধানিবেদন করেছেন, প্রেম নিবেদন করে ব্যর্থ হয়ে নিছক আবেগ বশত অনুরূপ আরেক নারী সম্পর্কে বলেছেন :

নারী নাহি হতে চায় শুধু একা বসারো

এরা দেবী, এরা লোভী, যত পূজা পায় এরা চায় তত আরো।

ইহাদের অভিলোভী মন

একজনে ভৃগু নয়, এক পেয়ে সুখী নয়,

যাচে বহুজন<sup>১৭</sup>

কথাসাহিত্যে ওই একই ভাষায় ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ লক্ষ করা যায়-

দুনিয়ার সবচেয়ে মস্ত হৈয়াদী হ'চ্ছে মেয়েদের মন<sup>১৮</sup>

মেয়েমানুষ আর আঙুন-এ দু-ই সমান বুঝলি, দু-টোতেই হাত পোড়ে<sup>১৯</sup>

এ-রকম আরো দু'চারটে উদাহরণ এই বক্তব্যের সমর্থনে দেখা যায়।

যেমন-

নারী-তাহাকে সে যেমন অশ্রদ্ধা করে তেমনি ভালোওবানো, উহার সূন্দর যাদুকরী।<sup>২০</sup>

## সাহিত্যিকী

নারী সম্পর্কে এই মানসিকতা পোষণ একজন সাম্যবাদী চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে অপ্রত্যাশিত। ‘বৃহেলিকা’ উপন্যাসে নজরুল জাহাঙ্গীরের মুখে নারী সম্পর্কে সমান স্ববিরোধী ভাষা প্রয়োগ করে নিজের অস্থির মানসিকতারই বর্হিপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। অথবা বলা যায়, আত্মবিধ্বংসী কথা বলে নিজের সাম্য চিন্তার আদর্শের বিসর্জন দিয়েছেন। কেননা, তিনি ‘বারাঙ্গনা’ কবিতায় নারীর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে চরিত্রহীন পুরুষদের বারান্দা বলেছেন। অথচ সেই তিনি আবার বলেছেন-

আমি প্রেমও বিশ্বাস করিনে, পৃথিবীর কোনো নারীকেও বিশ্বাস করিনে। মনে হচ্ছে, তোমার সব কথাই আর কারুর শেখানো, অথবা এগুলো অতিরিক্ত নভেল পড়ার বদহজম। তোমাদের জাতটাই নির্বাসন হওয়া উচিত। একেবারে কালাপানি।<sup>২৮</sup>

নারী সম্পর্কে নজরুলের এই ভাষা পুরুষ নিয়ন্ত্রিত মধ্যযুগীয় সমাজের বক্তব্যেরই প্রতিফলন। সামন্ত সংস্কৃতি নারীকে পুরুষের ভোগ বিলাসের পণ্য আর সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবেই বিবেচনা করেছে। ইংরেজ রাজত্বে বাঙালি সমাজের কোষে কোষে সেই অশুভ সংস্কৃতির প্রতিফলন অব্যাহত ছিলো। নজরুল সেই যুগের লেখক। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোও সামন্ত যুগেরই প্রতিনিধি। তাই, তাদের মুখে নারী সম্পর্কে এই ধরনের ভাষা প্রয়োগ করে নজরুল সেই সময়ে যথাযথভাবে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন।

ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশি যথেষ্টভাবে প্রকাশের অবকাশ সাহিত্যে নেই বলেই আলোচকেরা মনে করেন। তবুও কবি নজরুল মনে হয় সে দিকটার প্রতি অতিমাত্রায় সহানুভূতিশীল ছিলেন বলে নারী সম্পর্কে এমন অসম্মানজনক ভাষা প্রয়োগ করে স্ববিরোধী বক্তব্যে নিজেকে জড়িয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর সংযম আর পরিমিতি বোধ ছিলো না।

নজরুল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, ‘অদম্য স্বতঃস্ফূর্তি নজরুলের রচনার প্রধান গুণ এবং দোষ। যা-কিছু তিনি লিখেছেন দ্রুতবেগে; ভাবতে, বুঝতে, সংশোধন করতে কখনো থামেননি, কোথায় থামতে হবে দিশে পাননি। সম্পাদক বঙ্গুরা কিছুতেই লেখা আদায় করতে না-পেরে কাগজ, কলম, চা ও পান দিয়ে তাঁকে একটা ঘরে বন্দী করে রেখেছেন-ঘন্টাখানেক, পরে পাওয়া গেছে সম্পূর্ণ একটি কবিতা। আশ্চর্য ক্ষমতা সন্দেহ নেই, কিন্তু সব সময় এতে কাজ চলে না, আর যখন চলে না তখন ফল হয় খুব খারাপ; এ ক্ষমতা চমকপ্রদ, কিন্তু নির্ভরযোগ্য নয়। এদিক থেকে বায়রনের সঙ্গে নজরুলের সাদৃশ্য ধরা পড়ে-সেই কাঁচা, কড়া, উদ্দাম শক্তি, সেই চিন্তাহীন অনর্গলতা, কাব্যের কল-কজার উপর সেই সহজ নিশ্চিত দখল, সেই উচ্ছৃঙ্খলতা, আতিশয্য, শৈথিল্য, সেই রসের ক্ষীণতা, রূপের হীনতা, রুচির স্বালন। নারীসহ তাঁর

কবিতায় এবং গল্প-উপন্যাসে অন্যান্য বিষয়ে স্থির চিন্তার অভাবে, কিশোর সুলভ আবেগ আর অস্থিরতার কারণে যে ভাব আর ভাষা প্রকাশ করেছেন তাতে তাঁকে কখনো মায়ের জাতি বিদ্বেষী বলে প্রতীয়মান হয়। তবে, এ কথা সত্য, সাময়িক আবেগে যে কথাগুলো তিনি রচনা করেছেন, তা একান্ত তাঁর বিশ্বাসের কথা নয়। নিছক আবেগ ‘চিন্তাহীন অনর্গলতা’রই বর্হিপ্রকাশ মাত্র। এ প্রসঙ্গে স্বপন চক্রবর্তীর একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছেন, ‘ব্রাত্য বা উপেক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে দেশের সভ্যত মননবিশ্বের সঙ্গে নিরন্তর রফার নিয়তিকে তিনি পরিহার করতে পেরেছিলেন বেশ কিছুটা। উপনিবেশবাদের সঙ্গে সংঘর্ষের মডেলটা বরঞ্চ তাঁর বেলা খাটে। নাশকতামূলক লেখা, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি, জাতপাত ও সম্প্রদায়ের রাজনীতির প্রতি ঘৃণা, পশ্চিমের সাম্যবাদী ভাবনার কাছে নামমাত্র ঋণী তাঁর শ্রেণী ও লিঙ্গের সাম্যের ধারণা এসব তো ছিলই। তাঁর কবিতার অভিনবত্বের মধ্যেও শাসকের অনুমোদিত সাংস্কৃতিক শিষ্টাচারের বিরুদ্ধে এক ধরনের বেসামাল জেহাদ করে।’<sup>২২</sup> তাঁর কথাসাহিত্যে আবেগের সংযম না থাকলেও সৃষ্টির অভিনবত্ব ছিলো এবং সেটা একান্তই তাঁর মানসলোকের বন্ধাহীন প্রকাশই তাতে ঘটেছে। এতে যেমন তাঁর মানসিক শক্তির পরিচয় মেলে, তেমনি ভাবাবেগের আতিশয্যের মধ্যে দিয়ে সমাজ আর জীবনকে এক স্বতন্ত্র ধারায় দেখারও পরিচয় মেলে। আবুল ফজলও নজরুলের ‘গল্প : উপন্যাস : নাটক’ নিয়ে : আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, ‘সার্থক ছোটগল্প লিখিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন রচনায় অতিমাত্রায় সংযম ও পরিমিতি জ্ঞান। কবি মাত্রেই সাধারণতঃ হইয়া থাকেন কিছুটা আবেগ প্রবণ-নজরুলের রচনায়ও এই আবেগের আধিক্য সহজেই গোচরীভূত।’<sup>২৩</sup>

মোতাহের হোসেন চৌধুরী আবু সয়ীদ আইয়ুবের মতকে সমর্থন করে বলেছেন, ‘নজরুলের একটি ক্রটি, তাঁর বিবেচনায়, আবেগের অনিয়ন্ত্রণ, এবং তা ঘটেছে বুদ্ধিচর্চার অভাবে’<sup>২৪</sup>

এই একই কথা আতোয়ার রহমানও বলেছেন: ‘নজরুল নিজেকে আরোপ করবার ফলেই রচনাগুলি হয়েছে আবেগ প্রবল। আবেগের আতিশয্য তো কথাসাহিত্যের পক্ষে কখনও মঙ্গলজনক নয়। নজরুল তাঁর প্রায় সমস্ত প্রেমের গল্পেই, বিশেষ করে, প্রথম গ্রন্থ দুখানিতে আবেগের বন্যায় আঙ্গিককে ভাসিয়ে দিয়েছে।’<sup>২৫</sup>

নজরুলের ভাষার এই আবেগ প্রসঙ্গে আহমদ শরীফও একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তা হলো: ‘তিনি যা দেখেছেন, তা-ই বলেছেন, ভাবেন নি কিছুই। তিনি চোখের আনুগত্যে চলেছেন, অন্তরের নির্দেশ পাননি। এর একাধিক গূঢ় কারণ আছে নিশ্চয়ই। সেগুলোর একটি শিক্ষাগত আর একটি আবেগ সজ্জাত।’<sup>২৬</sup>

## সাহিত্যিকী

ভাষা তাঁর যুক্তি মানেনি, ভাবাবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। কিন্তু ভালোবাসা যে আবেগেরই বর্হিপ্রকাশ এ বিষয়টাও বিবেচনা করতে হবে-নজরুলের সাহিত্য বিচারে। আর একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, নজরুল যেমন ভালোবাসতেও পারতেন নিঃশর্তে তেমন তার সরল প্রকাশও ঘটাতে পারতেন কোনো কিছু না ভেবে। এই সারল্য এবং আন্তরিকতা সবার নেই। ব্যক্তি নজরুলের সারল্য উচ্ছলতার সঙ্গে তাঁর ভাষার যোগসূত্রে নিবিড় তা না মেনে উপায় নেই। কেননা, এটাও তাঁর স্বপরিবল্লিত প্রকাশ ভঙ্গি।

### ৫. সংলাপ : আঞ্চলিক ভাষা

নজরুলের আঠারটি গল্পের মধ্যে সাতটির নায়ক সৈনিক। সাতটিতে যুদ্ধের ঘটনার সমান্তরালে প্রেম-বিরহের কথা তিনি বিবৃত করেছেন। কিন্তু তার মধ্যে ঘটনা ও ভাষা বৈচিত্র্য অনুপস্থিত। ‘হেনা’ গল্পটি ব্যতীত সব কাহিনীর পরিণতি ট্র্যাজিডি। ‘অতৃপ্ত কামনা’, ‘রাজবন্দীর চিঠি’, ‘শিউলিমালা’ ‘বাদল-বরিষণে’ ‘মেহের নেগার’, ‘পদ্ম গোখরো’-সব গল্পই বিয়োগান্তক। কিন্তু এই সব গল্পের ভাষা, কাহিনী-পট সব সমগোত্রীয়। তবে তাঁর ‘রাফুসী’, ‘জিনের বাদশা’ গল্প দু’টি সবদিক থেকে সাফল্যের দাবীদার। বিশেষ করে চরিত্রের সংলাপে আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ সাফল্যের কথা বিবেচনা করলে এ-কথা মানতেই হবে।

‘রাফুসী’ গল্পে মূল চরিত্রের সংলাপে বীরভূমের বাগ্‌দীদের মুখের ভাষা ব্যবহারে চরিত্রের প্রকৃত রূপ ফুটে উঠেছে। ‘জিনের বাদশা’ গল্পেও পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষা সংলাপে প্রয়োগ করে গল্পটির সমগ্রকাহিনী সেই সঙ্গে চরিত্রগুলোকেও সার্থকভাবে উপস্থাপন করেছেন। ‘মৃত্যুক্ষুধা’ উপন্যাসেও নজরুল কৃষ্ণনগরের কথ্যভাষা কতিপয় চরিত্রে-বিশেষ করে প্যাকালে, মেজবউ, হিড়িমা, প্যাকালের মা ও শিশুদের মুখে যথার্থ প্রয়োগ করেছেন। এখানে তার দু’একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো।

হারাম-খোর খেরেস্তান (কোথাবদার) হারাম খেয়ে খেয়ে তোদের গায়ে বন-শুয়োরের মত চর্বি হয়েছে, না লা?

তা বলবি বই কি লা স্টুটকি! ছেলের তোর খেরেস্তানের বাড়র হারাম রাঁধা পয়সা খেয়ে চেকুনাই বেড়েছে কি না!

ওলো আগ-ধুমসি (রাগধুমসী)! ওলো ভাগলপুরের গাই! ওলো, আমার ছেলে খেরেস্তানের ভাত রাখে নাই লো, আমার ছেলে জজ সায়েবের খানসামা ছিল-জজ সায়েবের লো, ইংরেজের।

আ-সইরন সইতে নারি, সিকেয় হয়ে দিয়ে বুলে মরি! বলি, অ’ গজালের মা। ঐ জজ সাহেবও আমাদেরই জাত। আমরা “আজার” (রাজার) জাত, জানিস? <sup>২১</sup>

## নজরুল কথাসাহিত্য : ভাষা বিন্যাসের নবদিগন্ত

কৃষ্ণনগরের কথ্যভাষার আরো কিছু দৃষ্টান্ত ‘মৃত্যুকুণ্ঠা’ উপন্যাসে শিশু চরিত্রের সংলাপে পাওয়া যায়-

তোমার বিগু আনতে হবে না ছোট কাবা, তুমি অমনি এস।”

মাকে বলে, “আচ্ছা মা, ছোট-চা বুঝি বা-জানের কাছে চলে গিয়েছে? উধেনে থেকে বুঝি আর ছেড়ে দেয় না?”<sup>২৬</sup>

শিশু আর নারী চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ নজরুল কথাসাহিত্যে অধিক লক্ষ করা যায়। নজরুলের এই দিকে সজাগ দৃষ্টি ছিলো। সমাজের দরিদ্র-ব্রাত্য বাসিন্দাদের মুখের ভাষাতেও আঞ্চলিক ভাষায় বেশি কথা বলতে দেখা যায়। যেমন ‘কুহেলিকা’ উপন্যাসে জমিদার বাড়ির সবাই মান্যচলিত ভাষায় কথা বলেছে কিন্তু ঝি মোতিয়ার সংলাপে পূর্ববঙ্গের ভাষা প্রয়োগ করেছেন। এটা তাঁর কথাসাহিত্যের সংলাপের বাস্তব নিদর্শন।

বাগাম আম্মা, আপনি দেইহা বুঝবার পারছেন না, ভাইজানের মুখ কামান শুরুষবু অইয়া গিয়াছে। জোয়ান পোখার সাদি না দিলে সে অই ব্যাওয়া অইয়া যাইব না?”<sup>২৭</sup>

অথবা-গাড়োয়ানের ভাষার কথাও আমরা এ প্রসঙ্গে বলতে পারি। সে দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ। ভদ্রলোকের ভাষা তার অজানা অথবা আয়ত্বহীন। সে জাহাঙ্গীরের কথার উত্তর দেয় তার আজন্ম শেখা ভাষায়।

হজুর উয়াকে চিনব না? এই তো সেদিন আমাদের কাছে ভেংডেঙিয়ে বড় হয়ে উঠল।<sup>২৮</sup>

তারপর গাড়োয়ান আবার বলে-

হজুর মা বাবা। কালই সন্ঝে বেলা আমি হাজির হব এসে। হজুর এই খেনেই থাকবেন তো?<sup>২৯</sup>

গাড়োয়ানের ভাষা পুরোপুরি বর্তমান অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষারই ইঙ্গিত বহন করে। মনুয়ার নুরুর কাছে চিঠির ভাষায়ও কখনো পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছে।

আরে মিয়া, হঃ! আমি না কইছিলাম যে, এ সব কাগজ লইতাম না? এই সব ফাজিল চ্যাংরায়াহাতে ল্যাংহে, হেই কাগজ না আবার মান্বে পড়ে? আমার চারড্যা ট্যাংহা না এক্কেবারে জলে পরলো নি?<sup>৩০</sup>

আবার ‘রাফুসী’ গল্পে-

## সাহিত্যিকী

তাছাড়া, আমি মানুষের দেওয়ার চেয়ে অনেক বড় শক্তি পেয়েছিলুম নিজের মনের মাঝে। আমার জ্বালাটা যে সদা সর্বদা কি রকম মোচ্ড়ে মোচ্ড়ে উঠত তা কে বুঝত বল দেখি বুঝ? নিজ হাতে কটলেও সে তো ছিল আমার নিজেরই সোয়ামী। বেগন জজ নাকি তাঁর নিজের ছেলের ফাঁসির ছবুম দিয়েছিলেন, তা হলেও-অত শক্ত হলেও তাঁর বুকে কি এতটুকু লাগে নাই ঐ ছবুমটা দিবার সময়? আহা যখন তার বুকে বসে একটা পেরকান্ড রাক্ষসীর মতোই তার গলায় দা-টা চেপে ধরলুম, তখন আঃ কী মিনতি ভরা গোঙানিই তার গলা থেকে বেরোচ্ছিল। চোখে কী সে একটা ভীত চাউনি, আমার কাছে ক্ষমা চাইছিল।- আঃ আঃ<sup>৩৩</sup>

‘জিনের বাদশা’ গল্পের সংলাপেও আঞ্চলিক ভাষার সার্থক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

“তুমি কোহান থ্যা আইলে।”

আল্লা-রাখা বলল, “তুইল্যা দেহি তুমি। আল্লারে আল্লা, খোদার আনছিল আমারে এই পথে, নইলে কি আইত। কি আইছিল তোমার?”<sup>৩৪</sup>

সংলাপে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে নজরুল যথেষ্ট শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। সমসাময়িক কালে শৈলজানন্দ ‘কয়লাকুঠি’ গল্পের সংলাপে আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ করেন। নজরুল সেক্ষেত্রে অবশ্যই অগ্রণী। তাঁর এই উদ্যোগ তর্কাতীত ভাবে সাফল্যের দাবীদার এবং প্রশংসনীয়। কেননা, শরৎচন্দ্র (১৮৭৬-১৯৩৮) রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে এ দৃষ্টান্ত দুর্লভ। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সংলাপে আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ করেননি। নজরুল সংলাপে আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ করে তাঁর সেই সাফল্য প্রমাণ করেছেন। এটা তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর।

### ৬. সংলাপ ৪ শব্দ প্রয়োগের নতুন মাত্রা

বাংলা কবিতায় নজরুলেরও বহু আগে সমগোত্রীয় ভাষার শব্দ প্রয়োগের সূচনা হয়েছিলো। শুধু পুঁথিসাহিত্য বা ইসলাম ধর্ম ভিত্তিক কবিতাতেই নয়, অন্যান্য কবিতাতেও শব্দ বিশেষ করে আরবি-ফারসি ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। শ্রীরামপুর মিশনের বাঙালি মুন্সি বা খোদ মিশনারীদের গদ্যেও আরবি-ফারসি ভাষার মিশেল ঘটেছে। রামরাম বসু (১৭৫৩-১৮১৩) বা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের (১৭৬২-১৮১৯) গদ্যেও যে দৃষ্টান্ত অত্যন্ত সুলভ। কবিতার ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪), প্রমুখের রচনায় এর পরিচয় মিলবে। নজরুলের কথাসাহিত্যে বর্ণনা-বিশ্লেষণের ভাষার তুলনায় সংলাপে এই বিষয়টির সার্থক প্রয়োগ লক্ষ করার মতো। তিনি কোনো হিন্দু ধর্মাবলম্বী চরিত্রের ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ করেননি। বরং, তাঁদের বাংলা শব্দের সঙ্গে দু’চারটে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার বেশি বাস্তব সম্মত। কিন্তু মুসলিম চরিত্রের ভাষায় উর্দু- আরবি-ফারসি শব্দই প্রধান। যেমন-

“কাজরীয়া গে। ক্যা তোরি সাবলিয়া আ গয়ি?”

“নহিরে সজনিয়া, নহি। য়েও পরদেশী জোয়ান”।

“ক্যা তোরি দিল ছিন্ লিয়া?”<sup>৩৫</sup>

## নজরুল কথাসাহিত্য : ভাষা বিন্যাসের নবদিগন্ত

‘কুহেলিকা’ উপন্যাসে মৌলবী চরিত্রের বাংলা বাক্যে এ-রকম উর্দু-আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগ করেছেন, আবার কখনো সমুদয় বাক্যই বিদেশী ভাষার-

খোদার মর্জি বাচ্চা! সব মেঘ কেটে যাবে। মাকে অসহ্য করে না, খোদার রহম, আপনি তোমার উপর নাজেল হবে।

জাহাঙ্গীর হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, ‘সোবহান আল্লাহ মৌলবী সাহেব! ক্যা তরিকা বাতায় আপনে।’<sup>৩১</sup>

অথবা শিক্ষিত পরিবারের সদস্যদের মুখে বাংলার সঙ্গে বিদেশী- বিশেষ করে ইংরেজি ভাষার প্রয়োগ-

“ব্রাভো” তবে আমাদের পায় কে? গ্রাভ গল্প করে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।”<sup>৩২</sup>

এ-রকম অসংখ্য উদাহরণ হাজির করা যায়। যেমন-

কিন্তু তুমি যাই বল আজহার, অ্যাংলোইন্ডিয়ানের ডিফেন্স-ওর বুঝি জগতে তুলনা নাই। আর বোগোল-জুবো? ও যে অ্যাংলোইন্ডিয়ানের কাছে তিন-পাঁচে পনের হেরে ভূত হয়ে গেছে। ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলায় অমন দু’চার বাজি সমস্ত ওয়ার্ল্ড-চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলায় অমন দু’চার বাজি সমস্ত ওয়ার্ল্ড-চ্যাম্পিয়নই হেরে থাকেন।....<sup>৩৩</sup>

অথবা-

“হ্যাঁ হুজুর আলবৎ!”

“ওরে বেবুন দল, ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।”<sup>৩৪</sup>

বিশ্লেষণের ভাষাতেও নজরুল দক্ষভাবে ভিন্ন ভাষার শব্দ প্রয়োগ করেছেন।

কোন ব্লগে আমার ‘প্রমোশন’ ষ্টপ হয়নি। বহু গবেষণার ফলেও হেড মাস্টার মহাশয় আবিষ্কার করতে পারেননি-আমার মত বওয়াটে ছেলেরা কি করে পাশ নম্বর রাখে-ভায়া, ঐখানেই তু genius এর প্রতিভার পরিচয়।”<sup>৩৫</sup>

তোর চিঠিটা আমার ভোজপুরী দারোয়ান ম’শায়ের ‘খু’ দিয়ে বল সন্ধ্যা-চায়ের টেবিলে ব্লগন্ত করুন বেশে এসে হাজির। দেখি, রিডাইরেকটের ধস্তা-ধস্তিতে বেচারার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হ’য়ে গেছে।”<sup>৩৬</sup>

এখানে আরেকটি ভাষা উদ্ধৃতি হিসেবে দেয়া যায়-

যুবকের গায়ে খেলাফতি ভলান্টিয়ারের পোশাক। কিন্তু এত ময়লা যে চিমটি কাটলে ময়লা ওঠে। খন্দরেরই জামা-কাপড়া কিন্তু এত মোটা যে, কত্তা বলে ভ্রম হয়। মাথায় সৈনিকদের “ফেটিং-ক্যাপের” মত চুপি, তাতে কিন্তু অর্ধচন্দ্রে বদলে পিতলের ক্ষুদ্র তরবারি-ক্রসের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনাত্মক একটা ছোট লোহার ত্রিশূল। হাতে দরবেশী ধরণের অষ্টাবক্রীয় দীর্ঘ ষষ্টি। সৈনিকদের ইউনিফর্মের মত কোট-প্যান্ট।.....<sup>৩৭</sup>

## সাহিত্যিকী

বর্ণনা বিশ্লেষণের মতো সংলাপেও 'চলিত' ভাষা নজরুল প্রয়োগ করেছেন সেটা উপরিউক্ত উদাহরণগুলো থেকেই স্পষ্ট। আর বাংলার সমগোত্রীয় এবং বিদেশী ভাষার শব্দ প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন এ কথা উল্লেখ না করলে তার প্রতি অবিচার করা হবে।

### ৭. গীতিকাব্যিক ভাষা

নজরুল ইসলামের গদ্য কাব্যময় এক ব্যঞ্জন ধ্বনিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যও সেই আভাস মেলে। গদ্যের গীতিময়তার মধ্যে যুক্তি-বুদ্ধির চেয়ে হৃদয়বস্তির প্রকাশই অধিক ঘটে। রূপকল্প, আবেগ প্রকাশের কারণে এই শ্রেণীর গদ্যে রোমান্টিক ভাষার ব্যাপকতা বেশি বলেই প্রতীয়মান হয়। বাংলা গদ্যের এটাও এক প্রকার অঙ্গসজ্জা বলে আমরা বলতে পারি। কিন্তু জগৎ আর জীবনের প্রকাশের সমান্তরালে যদি বিশ্লেষণ-মূল্যায়নের দিকটি অনুপস্থিত থাকে তাহলে সেটা অনেকটা কৃত্রিম বলেই মনে হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে, নজরুল এ বিষয়ে অনেকটা উদাসীন অথবা অসতর্ক ছিলেন। কিন্তু কোথাও কোথাও তিনি বেশ মুসিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা তাঁর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এবং ব্যক্তির শারীরিক বর্ণনার কথা উপস্থাপন করতে পারি।

চাঁদটা আকাশে ঢলে প'ড়েছে, আবার শা ক'রে বেরিয়ে আর একটা মেঘে সঁধিয়ে পড়ছে। এ যেন বাদশার শীষ-মহলের সুন্দরীদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা।<sup>৫০</sup>

শেষের বাক্যটি চাঁদ আর মেঘের খেলার সঙ্গে বাদশার রাজপ্রসাদের সুন্দরীদের লুকোচুরি খেলার সার্থক তুলনা।

রাস্তিরে শিরীষ ফুলের পরাগমাখা ঐ যে ভেসে' আসে তারি গন্ধ, ওকি তাঁরই বর-অঙ্গের সুবাস?  
গোরস্থানের সমস্ত শিরীষ, শেফালী আর হেনার গাছগুলি ভিজিয়ে, সবুজ দুর্বা আর নীল ভুই-  
বন্দমের গাছগুলিকে 'অর্দ্দ করে' ঐ যে 'সন্ধ্যা হ'তে সকাল পর্যন্ত শিশির ঝরে, ওকি তারই  
গলিত বেদনা?<sup>৫১</sup>

এ হচ্ছে প্রেমিক হৃদয়ের আর্তনাদের ভাষা। কখনো আপন মনে তিনি নিজেই গল্পের মধ্যে উপস্থিত হয়ে ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন, আবার কখনো হাল্কা চটুলতা করেছেন। নজরুল মানস প্রকৃতিও এ রকম ছিলো। তারই প্রতিফলন তাঁর কথাসাহিত্যে ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়। নিজের কথা তিনি যেভাবে ব্যক্ত করেছেন-

আরব-সাগরের বেলার উপরে একটি ছোট্ট পাহাড়। তার বুক রঙ-বেরঙ-এর শাঁখের হাং  
ভরা। দেখে মনে হয়, এটা বুঝি শঙ্খ-সমাদি। তাদেরই ওপর একলা পা ছড়িয়ে বসে যে কথা  
ভাবছিলাম। সে কথা কখনো বাজে উদাস পখিরের কাঁপা গলায়, কখনো প্রিয়-হারা ঘুঘুর উদাস  
ডাকে; আর ব্যপাতে কবির ভাষায় কখনো কখনো তার আচম্ভক্য একটি কথা-হারা কথা-উড়ে-  
চলা পাখির মিলিয়ে আসা ডাকের মত শোনায।<sup>৫২</sup>

## নজরুল কথাসাহিত্য : ভাষা বিন্যাসের নবদিগন্ত

এই দুই বর্ণনায় রূপকল্প আর উপমার ভাষা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাঁর গ্রামীণ প্রকৃতির বর্ণনাও অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

খুলি খুসরিত জন-বিরল গ্রাম পথ। দুই পাশে মাঠ ধূ-ধূ করিতেছে। যেন উদাসিনী বিরহিণী।  
দূরে ছায়া নিবীড় পল্লী-ঝিল্লীর ঘুম পাড়ানিয়া গানে যেন মায়ের কোলে শিশুর মতো  
ঘুমাইতেছে।<sup>৬৩</sup>

বন্ধুদের আড্ডার আসর কিংবা কোনো ব্যক্তির শারীরিক বর্ণনা নজরুল যেভাবে দিয়েছেন, তাতে তাঁর ভাষায় রস বোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

দুই তিনটি চতুষ্পায়া জুড়িয়া বসিয়া প্রায় বিশ বাইশজন তরুণ। ইহাদের একজন লক্ষ্মীছাড়ার মতো চেহারা-একজন ইয়ারের উরু উপাধান করিয়া আছে। একজন ইয়ারের দুই স্বপ্নে পা তুলিয়া দিয়া নির্বিকার চিন্তে সিগারেট ফুকিতেছে। এ আলোচনায় কেবল তাহারই কোনো উৎসাহ দেখা যাইতেছিলনা। নাম তাহার বখতে জাহাঙ্গীর কী উহা অপেক্ষাও নাসিব বুলন্দ দারাজ গোছের একটা কিছু। কিন্তু অপব্যবহারের দরুন তাহা এখন আর কাহারও মনে নাই। তাহাকে সবলে উপেক্ষা বা আদর করিয়া উল্খলুন বলিয়া ডাকে। এ নাম কে তাহাকে প্রথম দিয়াছিল, এখন আর কেহই বলিতে পারে না। এ নাম দেওয়ার গৌরবের দাবি লইয়া বহু বাগ্বিত্তা হইয়া গিয়াছে। এখন এই নামই তাহার কয়েম হইয়া গিয়াছে। উল্খলুন উর্দু শব্দ, মানে এর বিশৃঙ্খল, এলোমেলো।<sup>৬৪</sup>

ব্যক্তি জীবনে তুখোর আড্ডাবাজ আর হাসি-খুশির মানুষ ছিলেন নজরুল। গানের অথবা সাহিত্যের আসরে তিনি ছিলেন মধ্যমনি। তাঁর সেই মন-মেজাজের ছাপ কথাসাহিত্যেও পড়েছে। সুযোগ পেলে তিনি রসিকতা বা ছেলেমানুষি করতে ছাড়েননি। শিশুতোষ কবিতাগুলোতে এই দুটোই খুব সুলভ। গল্প উপন্যাসেও সেটা রয়েছে। যেমন-

আমীর তার “গ্যাং” কে চুপিচুপি কি বললে। সবলের চোখে মুখে খুশির একটা তীব্র হিল্লোল বায়ে গেল-হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলঝলানির মত। চুনীবিদ্যীর মত মুখ করে সবলে বেরিয়ে গেল। তারপর বাইরের দিকে থেকে এসে ঈশৎ দরজা ফাঁক করে দেখতে লাগল। কিন্তু লোকটার চেহারা দেখে অনেকটা উৎসাহ কমে গেল। ওর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদে যেটি, সে প্রায় বেঁদে ফেলে বললে, ‘ও বাঁ বাঁ! জুঁ জুঁ!’ তার একধাপ উঁচু সিনিয়র ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বললে, উহু, ছেলে-ধরা, ঐ দেখু ঝুলি’। “বলেই কিটবাগটা দেখিয়ে দিলে।। বাস আর যাবে কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে আমীর ছাড়া আর সবলে “মার মার না পগার পার” করে দৌড় দিলে।

আমীর কিন্তু হটবার ছেলে নয় তার উপর সে দলপতি। ভয় যতই করুক, পালিয়ে গেলে তার খ্রিস্টিজ থাকে না। কাজেই সে কিছুই না বলে গভীরভাবে একটা লম্বা খড় এনে সোজা নিদ্রিত যুবকটির নাকের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দিল; যুবকটি একেবারে লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠল। আমীরের স্মৃতি দেখে কে। সে তখন হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়েছে।<sup>৬৫</sup>

## সাহিত্যিকী

গল্প বা উপন্যাসে এ ধরনের হাস্য-কৌতুকের দৃশ্য অবতারণার পাশাপাশি তিনি মাটি আর মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসার কথাও ব্যক্ত করেছেন। দেশ-মানুষ-প্রকৃতি প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর যে একীভূত হওয়ার বিশাল অন্তর ছিলো, নানা অনুশঙ্গে তিনি অকৃত্রিমভাষায় তা ব্যক্ত করেছেন।

‘কুহেলিকা’ উপন্যাসে জাহাঙ্গীর বন্ধু হারুণের সঙ্গে তাদের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছে। ট্রেন থেকে নেমে পরের দিন সকালে পায়ে হেঁটে পল্লীর মোঠো পথ ভাঙতে গিয়ে নগরবাসি জাহাঙ্গীর পল্লীর স্নিগ্ধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হয়ে বলে-

না ভাই। এ ধুলো আর ধুচ্ছিনে পথে। বাঙলার পথের ধুলো আমার জন্মভূমির বেদনাতুর পথিকের পায়ের ধুলো-ও শুধু বুক পর্যন্ত কেন মাথা পর্যন্ত উঠলেও আমি ধন্য হয়ে যেতাম। পবিত্র ধুলো কি অত তাড়াতাড়ি মুছতে আছে ভাই?<sup>৬৯</sup>

তারপর জাহাঙ্গীর আবার বলে-

ভাই ভাবছি হারুণ, এত বিপুল শক্তি এত বিরাট প্রাণ নিয়েও এরা পড়ে আছে কোথায়? এরা যেন উদাসীন আত্মতোলার দল, সবলের জন্য সুখ সৃষ্টি করে নিজে ভাসে দুঃখের অথই পাথারে। এরা শুধু কবি নয় হারুণ, এরা মানুষ। এরা সর্বভাগী ভপস্বী দরবেশ।<sup>৭০</sup>

মা আর মাতৃভূমির প্রতি গভীর অনুরাগের এই ভাষাও অত্যন্ত সাবলীল। ব্যক্তি নজরুলের আচরণেও সেটা প্রকাশ পেয়েছে অসংখ্য ঘটনায়।

দু’-একদিন ভাবি, হয়তো মায়ের এই অঙ্গ স্নেহটাই আসলে আমার এই বড়-মা দেশটাকে চিনতে দেয়নি। বেহেশত থেকে আদ্যে ছেলের কান্না মা শুনতে পাচ্ছেন কি-না জানিনে, কিন্তু এ আমি নিশ্চয় ক’রে ব’লতে পারি যে, মাকে হারিয়েছি ব’লেই-মাতৃস্নেহের ঐ মস্ত শিকলটা আপনা হ’তে ছিড়ে গিয়েছে ব’লেই আজ মা’র চেয়েও মহীয়সী আমার জন্মভূমিকে চিনতে পেরেছি। তবে এও আমাকে স্বীকার করতে হবে, মাকে আগে আমার প্রাণ ভরা শ্রদ্ধা-ভক্তি-আলোবাসা অন্তরের অন্তর থেকে দিয়েই আজ মা’র চেয়েও বড় জন্মভূমিকে ভালোবাসাতে শিখেছি।<sup>৭১</sup>

এ দূরন্ত আবেগের প্রকাশ হলেও নজরুল মানসের জীবন্ত পরিচয় এই ভাষার মধ্যেই নিহিত। আর তাঁকে সনাক্ত করতে হবে এই ভাষার মধ্যেই। তাঁর প্রবন্ধের শব্দে শব্দে দেশ আর মানুষকে ভালোবাসা এবং তাদের প্রতি মমত্ব আর সহানুভূতির ভাব নানা প্রসঙ্গে তিনি আন্তরিকভাবে ব্যক্ত করেছেন। ব্যক্তি নজরুল এই একটি বিষয়ে তাঁর আবেগময় ভালোবাসার যথার্থ প্রতিফলন খটিয়েছেন। তাঁর কথাসাহিত্যের ভাষা বিচারে এই দিকটি উল্লেখ করা প্রয়োজন বলেই মনে হয়।

## নজরুল কথাসাহিত্য : ভাষা বিন্যাসের নবদিগন্ত

### ৮. উপমার দৃষ্টান্ত

নজরুল ইসলাম বর্ণনা আর সংলাপে অত্যন্ত সরল ও নিরাভরণ ভাষায় উপমা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কথাসাহিত্যের এই সব উপমাগুলো সরল আর আভিজাত্যহীন জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন-

- ক. গানের সুর তার অতিরিক্ত কাঁপে নিশীথ রাতের বাদলা-হাওয়া যেমন করে কাঁপে বেনু বনে।  
মৃত্যুক্ষুধা (শ্রেষ্ঠ নজরুল, সম্পাদক: আব্দুল মান্নান সৈয়দ) পৃ. ৩৮০
- খ. মেজ-বৌ মুচকি হাসে। হাসি তো নয়, যেন দু'ফলা চাকু। ঐ, পৃ. ৩৮৩
- গ. বাড়ির মেয়েরা তিড় করে এসে কাঁদে শাবককে সাপে ধরলে বিহগ-মাতা ও তার স্বজাতীয় পাখির দল যেমন অসহায়ের মতো চিৎকার করে, তেমনি। ঐ পৃ. ৩৯৫
- ঘ. মেজ-বৌ মাটিতে এলিয়ে পড়েন, নিরাশ্রয় নিরবলম্বন ছিন্ন স্বর্ণহার যেমন করে ধুলায় পড়ে যায়, তেমনি করে। ঐ পৃ. ৩৯৭
- ঙ. ঘোমটার আড়াল হইতে একজোড়া উজ্জ্বল সুন্দর চক্ষু তারার মতো তাহার দিকে চাহিয়া আছে।  
(কুহেলিকা, নজরুল শ্রেষ্ঠ সংকলন, সম্পাদক: কল্যাণী কাজী ও অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, সাহিত্যম্-কলকাতা, ২য় প্রকাশ-১৪০৫, পৃ. ১৪০)
- চ. “ভদ্রর বৌকে ভাসুর সেবা করতে এলে যেমন অবস্থা হয়, তেমনি আর কি?” (কুহেলিকা-ঐ পৃ. ১৪১)
- ছ. রাত্রি বেলায় বন-হরিণীর চোখে শিকারীর ফ্লাশ লাইটের জ্যোতিধারা গিয়া পড়িলে সে যেমন মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই আলো হইতে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারেনা, তেমনি করিয়া ভূণী জাহাঙ্গীরের অনাবৃত সুডোল বলিষ্ঠ দেহের পানে চাহিয়া রহিল। (কুহেলিকা ঐ পৃ. ১৪২)
- জ. সদ্যস্নাত জাহাঙ্গীর তাহার গ্রীক ভাস্করের নির্মিত মর্মর মূর্তির মতো অনাবৃত দেহ লইয়া দাঁড়াইয়া, (কুহেলিকা ঐ পৃ. ১৪২)
- ঝ. কামনা ইচ্ছে ঠিক এই বাদলের মত; আর প্রেম জ্বলছে হৃদয়ের ঐ রবিরই মত একই ভাবে সমান উজ্জ্বল্যে! (ব্যথার দান, নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৬)
- ঞ. হাইতোলার মত মাঝে মাঝে দমকা বাতাস ছুটে আসছে! পাকা তবল্‌চির মত রেলগাড়ীটা কি সুন্দর কারফা বাজিয়ে যাচ্ছে, ‘পাঁটা কেটে ভাগটা দিন-পাঁটা কেটে ভাগটটা দিন।’ (রিক্তের বেদন, ঐ, পৃ. ৪১৫)
- ট. পদ্মার জলে তার মুখখানি যেন নিবেদিত পদ্মের মতো ভাসতে লাগল। (নজরুল শ্রেষ্ঠ সংকলন, সম্পাদক : কল্যাণী কাজী- ২য় প্রকাশ ১৪০৫, কলকাতা, পৃ. ২৮৫)
- ঠ. গিয়ে দেখলুম তার তাজু বাড়িটা ধূলি আর জঙ্গলময় হয়ে সদ্য বিধবা নারীর মতো হাহাকার করছে। (মেহের নেগার, ঐ, পৃ. ২৫৮)

‘শব্দচিত্র রচনা, উপমার নতুনতর ব্যবহার এবং প্রকৃতিকে বর্ণনার পটভূমি হিসেবে ব্যক্তি চরিত্রে আরোপ নজরুলের কল্পনা প্রতিভারই পরিচালক।’<sup>৭২</sup>

এক্ষেত্রে যেমন তাঁর রুচিবোধের পরিচয় প্রস্ফুটিত হয়েছে, তেমনি ভাষারও স্বাভাবিক চিহ্নিত হয়েছে।

### ৯. গান-কবিতাঃ নিরাভরণগদ্যের অন্তর্মাধুর্য

## সাহিত্যিকী

নজরুলের প্রত্যেকটি গল্প ও উপন্যাসে গান আর কবিতা, কখনো বর্ণনার ভাষায় কখনো চরিত্রের ভাষার মাধ্যমে পরিবেশন করেছেন। এর ফলে তাঁর গদ্যের যে স্বাভাবিক গতি তার সঙ্গে সেগুলোর আবেগময় প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর প্রত্যেকটি গল্প এবং উপন্যাসে বিশেষ চরিত্র প্রয়োজনে এবং কখনো অপ্রয়োজনে গান গায়, কবিতা আবৃত্তি করে। এখানে প্রমাণ স্বরূপ তার একটি সংক্ষিপ্ত খতিয়ান দেয়া হলো। যেমন-

- ক. “ওমান কাভলি” গাড়ার ভিতর দিয়ে, যাচ্ছিল তারা। একটা বিশিষ্ট ঘরের কাছে গিয়েই প্যাবগলে গান ধরে দিলে :  
কালো শশী রে, বিরহ-জ্বালায় মরি।  
(শ্রেষ্ঠ নজরুলঃ মৃত্যুক্ষুধা, পৃ. ৩৭৩)
- খ. বাঙালি কবির একটা চরণ মনে পড়ছে-  
ভূমি আমারি যে ভূমি আমারি  
মম বিজন-জীবন-বিহারী! (ঐ ব্যথার দান, পৃ. ৩০৩)
- গ. আবৃত্তি-  
দেখনু সে-দিন ফুল-বাগিচায় ফাঙন মাসের উষায়,  
সদা ফোটা পদ্ম ফুলের লুটিয়ে পরাগ ভূষায়.....(ঐ)
- ঘ. ‘হেনা’ গল্পেও-লেখকের ভাষায়, তখন আমার বন্ধু একজন বাঙালি যুবক ডাক্তার সেব গাছের তলায় বসে গাচ্ছিল,-  
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে  
বিদায় ক’রেছে যারে নয়নের জলে। (ঐ. পৃ. ৩১৭)
- ঙ. ‘বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী’ গল্পেও দেখা যায় আত্মকাহিনীকার গান গাচ্ছে-  
সে যে বন্ধু জাগায় সবন্ধু নয়ানে  
যেন, কি বলিতে চায়, না বলিয়া যায় যে (পৃ. ৩২৪)
- চ. ‘ব্যথার দান’ উপন্যাসের নায়ক এক দুঃসহ আবেগে প্রকাশ করেছেন আবৃত্তি আর গানে তার মনোভাব প্রকাশ করেছেন-  
এমন দিনে তারে বলা যায়  
এখন ঘন ঘোর বরিষায়। (নজরুল রচনাবলী ১ম খণ্ড পৃ. ৩৬২) .  
অথবা
- ছ. আমার নয়ন-ভুলানো এলে।  
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে। (ঐ. পৃ. ৩৬৮)
- জ. ‘রক্তের বেদন’ গল্পে আবেগ আর আত্মকথা প্রকাশে গানের ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন-  
সবল শিবল শিখিল করে বেরিয়ে পালা বাইরে  
দুঃশমন স্বজনের মত দিন-দুনিয়া নাইরে!  
ও তুই বেরিয়ে পালা বাইরে (ঐ, পৃ. ৪১২)
- ঝ. এই গল্পে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথাও ব্যবহার করেছেন নজরুল।  
দুজনে দেখা হ’ল মধু-যামিনীতে-  
কেন কথা বহিল না-চলিয়া গেল ধীরে (ঐ. পৃ. ৪১৬)
- ঞ. ‘রাক্ষুসী’ গল্পে ‘একপাল ন্যাংটা ছেলে ভিজতে ভিজতে গাইছিল-  
রোদে রোদে বিষ্টি হয়,  
খ্যাকশিয়ালের বিয়ে হয়।’ (ঐ. পৃ. ৪৬০)

## নজরুল কথাসাহিত্য : ভাষা বিন্যাসের নবদিগন্ত

ব্রাত্যজনের মধ্যে যে ধরনের ছড়া প্রচলিত তার সার্থক প্রয়োগ এটা। জীবনের সঙ্গে এই ধরনের ছড়া বাস্তব সম্মত। লেখকের এই দৃষ্টিভঙ্গি সতে পরিচায়ক এবং প্রশংসনীয়! লোক শিল্পের তথা লোকংস্কৃতির সঙ্গে আশেপাশে প কারণে তাঁর কথাসাহিত্যের ভাষায় সেটা প্রতিফলিত হয়েছে।

নজরুল কথাসাহিত্যে গান ও কবিতার একটি খতিয়ান এখানে দেয়া হলো :

| গল্পের নাম            | গানের সংখ্যা                       | কবিতার সংখ্যা |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|
| ব্যথার দান            | চার                                | এক            |
| হেনা                  | তিন                                | ×             |
| দাদল-বরিসণে           | দুই                                | দুই           |
| ঘুমের ঘোরে            | ছয়                                | ×             |
| অতৃপ্ত কামনা          | চার                                | ×             |
| রাজবন্দীর চিঠি        | এক                                 | দুই           |
| রিজেক্টের বেদন        | তিন                                | এক            |
| বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী | দুই                                | ×             |
| মেহের নেগার           | চার                                | ×             |
| সাঁঝের তারা           | দুই (বীণারসুর সহ)                  | ×             |
| রাস্কুসী              | এক (সুর করে ছড়া)                  | ×             |
| সালেক                 | এক                                 | ×             |
| স্বামী হারা           | এক                                 | ×             |
| দুরন্ত পথিক           | এক                                 | ×             |
| পদ্ম-গোখরো            | ×                                  | ×             |
| জিনের বাদশা           | ×                                  | দুই           |
| শিউলিমালা             | দুটি                               | ×             |
| অগ্নিগিরি             | দুই                                | ×             |
| বনের পাপিয়া          | প্রধান নারী চরিত্র গানের সুর শুনবে | ×             |
| উপন্যাসের নাম         |                                    |               |
| বান্দন হারা           | ছয় (বাজনায় গানের সুরসহ)          |               |
| মৃত্যুক্ষুধা          | সাত                                | ×             |
| কুহেলিকা              | দুই                                | ×             |

## সাহিত্যিকী

গল্প আর উপন্যাসে বর্ণনা-বিশ্লেষণ এবং সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ পেলেই নজরুল গান-কবিতা আবৃত্তির আশ্রয় নিয়েছেন। তাতে বাংলা গদ্যের এক নতুন রীতি সৃষ্টির কৃতিত্ব নজরুলকে দিতে হবে। কথাসাহিত্যের স্বাভাবিক গতি এবং রূপের বিষয় নিয়ে অনেকে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। এটা ঠিক যে, বাংলাগদ্যের বিসৃষ্ট গীতিধর্মী উদ্দাম ও আবেগের প্রকাশটাই তাতে প্রধান হয়ে উঠেছে। আর সে কারণে নজরুলের গদ্য এই পর্যায়ে স্বতন্ত্র। তাঁর অতি আবেগ গীতিধর্মীতার মর্যাদা হানির অপবাদ পেলেও আলোচককে দায়ী করা যাবে না। কেননা সেটাই সত্য, অন্তত তাঁর গদ্য সে সাক্ষ্যই দিচ্ছে। তবু বলা যায়, এটাই তাঁর গদ্যের স্টাইল, অর্থাৎ নজরুলীয় স্টাইল, যা একান্ত তাঁরই সৃষ্টি।

### ১০. কথাসাহিত্যের ভাষায় নজরুলের একটি দর্শন

নজরুলকে রাজনৈতিক সচেতন কবি হিসেবেও অনেকে মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর কবিতা আর কথাসাহিত্যে যে ভাষার আবেগ তাতে মান সম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তির বাইরে যাদের অধিষ্ঠান তাদের দেহ-মনে উত্তেজনা-উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু বিদ্যা-বুদ্ধিসম্পন্ন যুক্তিপ্রবণ ব্যক্তিকে তা আলোড়িত করতে পারে না। ফলে প্রথম পক্ষের উত্তেজনা-উন্মাদনা সমাজের বুদ্ধিসম্পন্ন যুক্তিবাদী বাসিন্দাদের উদার সমর্থনের অভাবে তা কাগজের আগুনের মতো সাময়িক দাউ দাউ করে জ্বলে দ্রুত নিভে যায়। এখানেই রবীন্দ্রনাথসহ ত্রিশোত্তরের কবি আর কথাসাহিত্যিকদের সঙ্গে নজরুলের রচনার মৌলিক পার্থক্য। তবে আমাদের এ কথাও বিচিনায় রাখতে হবে যে, বিশ্বব্যাপী বুর্জোয়া অর্থনীতি বিকাশের জোয়ারে সামন্তবাদী চিন্তা দর্শন ভেসে যাওয়ার প্রাক্কালে তার অবশিষ্ট বৈশিষ্ট্যের তথা উপাদানের একটা চিহ্ন তো মানুষের অভ্যাসে, মনোজগতে ও নিত্যকর্মে থাকবেই। সেই অবশিষ্ট চিহ্নের অসংখ্য তত্ত্ব, অসংখ্য ভাষা নজরুলের রচনার উপাদান হিসেবে দেখা দিয়েছে। নবযুগের মানুষ হয়েও ভাবে ও ভাষায়, কর্মে ও দর্শনে তিনি সর্বক্ষেত্রে একীভূত হতে পারেননি। বরং তাঁর ভাষার মধ্যে দীনজনে দয়া, করুণা দেখানোর একটা প্রবণতা বরাবরই লক্ষ করা যায়। যেমন-

‘কুহেলিকা’ উপন্যাসে হারুণের দরিদ্র পরিবারের প্রতি জাহাঙ্গীরের ধনী মায়ের করুণা। জাহাঙ্গীরের দীপান্তর হওয়ার পর তার সম্পত্তি দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়ার অভিলাষ ব্যক্ত করা-এসবই রাজনৈতিক, বিশেষ করে সাম্যবাদী, স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তির এক ধরনের ভাববাদী মানসিকতার পরিচয় বলেই মনে হয়। আমাদের দেশে অনেক রাজনীতিকের জীবনেও এ রকমভাবে পৈতৃক ধন-সম্পত্তির বিলানোর কথা আমরা জানি। এই ভাবে ধন-সম্পত্তি বিলানোর মধ্যে অবশ্যই দরিদ্র শ্রেণীর মুক্তি যেমন আসেনি, তেমনি তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করে নতুন সমাজও গড়তে পারেনি। কারণ, পরধন পেতে পেতে পরজীবী, ভিক্ষাবৃত্তির কুঅভ্যাস রপ্ত করে কেবল পরমুখাপেক্ষি হয়েছে, তারা আর্থ-রাজনীতিক মুক্তি পায়নি। তাদের দুর্ভাগ্য

কারণ, যারা শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে তাদের সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা সঠিকভাবে শেখানো জানানো হয় নি বলেই এই দূরাবস্থা। এ কারণেই ‘কুহেলিকা’র জাহাঙ্গীর ‘মৃত্যুক্ষুধা’র আনসার এরা কেউ প্রকৃত প্রস্তাবে সংগ্রামী রাজনীতিবিদ হতে পারেনি। এরা যেন সেই সমস্ত সামন্তবাদী আর পাতিবুর্জোয়া রাজনীতিক নেতাদের মতো নিজের নেতৃত্ব বলবৎ রেখে জনগণকে করুণা কৃপা দেখিয়ে সস্তা বাহবা নিয়ে কর্মঠ আর সংগ্রামী মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙেফেলার মতো আত্মঘাতী কর্মে তৎপর থেকেছে। তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডও যুক্তি-আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেয়ে আবেগ আর রোমাঞ্চে পরিপূর্ণ। ভাষাও তাদের আবেগঘন রোমাঞ্চকর কর্মসূচীর সঙ্গে মিলেছে। যেমন-মেজ-বৌকে কৃষ্ণনগর থাকতে যতোরকম সাহায্য প্রয়োজন তা দেয়ার জন্য আনসার বলে,

তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তুমি এখানেই আলাদা ঘর বেঁধে থাক আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো যাতে তোমার দিন নিশ্চিন্তে চলে যায়।<sup>১৩</sup>

এই সাহায্যের আশ্বাসে অবশ্যই মেজ-বৌয়ের দারিদ্র্য অভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মানসিকতার ক্ষতি হয়। তাদের মতো মানুষের প্রয়োজন সংগ্রামী শিক্ষা এবং লড়াই করে বেঁচে থাকতে প্রত্যয়ী হওয়ার পথ নির্দেশ দেয়া; তা না তাকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে তার আপন অস্তিত্বে দৃঢ় ভাবে দাঁড়ানোর পথে তেমনি আবেগী প্রলোভন দেয়া। আর এটা শোষণহীন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোনো রাজনৈতিক আদর্শ হতে যেমন পারে না এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সাবলম্বী করারও কোনো মন্ত্রণা বা রাজনৈতিক কর্মসূচীও হতে পারে না।

‘কুহেলিকা’তেও জাহাঙ্গীরের মার পক্ষে দেওয়ান বলে,-

শুধু ওদের তো নিতে আসিনি, আপনাদের সকলকেই যে নিতে এসেছি। আপনার পৈতৃক ভিটে চিরদিনের জন্য ছেড়ে যেতে বলছি, কিছুদিন বলাবাতা থেকে আপনাদের দুইজনাই চিবিংসাপত্র করার-খোদা যদি ভালো করে তোলেন আপনাদের আবার ফিরে আসবেন এই বাড়িতে।<sup>১৪</sup>

জাহাঙ্গীরও জেলখানায় তার মাকে বলেছে,

ভুল কবেছ মা, ও ঐশ্বর্যের মালিক যদি আমি হই, তাহলে ঐ ঐশ্বর্যের ভার তার হাতেই ছেড়ে দিও। আমার মার মত শত শত মা আজ নিরন্ন, তাঁদের মুখে তাঁদের সন্তানের মুখে সে অন্ন দেবে। ও ঐশ্বর্য এখন আমার দেশের নির্যাচিত ভাই বোনদের। এবার সে এলে তাকে ফিরিও না। হাঁ, ভূনীকে আমার সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ ছেড়ে দিও। ও অনেক দুঃখ পেয়েছে।<sup>১৫</sup>

এ সবই ভাববাদী রাজনৈতিক ব্যক্তির ভাষা। এই রাজনীতি মার্কসবাদী নয়, একান্তই নজরুলের স্বকল্পিত। তাঁর কথাসাহিত্যে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ড, কথাবার্তা সবই তাঁরই মতো আবেগাক্রান্ত। যুক্তি-আদর্শের চেয়ে হৃদয়বৃত্তির প্রাবল্যই এই রকম সম্ভবনাময় চরিত্রগুলোকে তাঁর রচনার গুণগত মান ক্ষুণ্ণ করলেও তিনি এই ভাষাগুণে স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তি হিসেবে বাংলার কথাসাহিত্যে স্থান করে নিতে পেরেছেন।

তবে এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত যে, নজরুলের রাজনৈতিক দর্শন সেদিনের এবং আজকের রাজনৈতিক নেতাদের মতো মানবতাকে অতিক্রম করে নয়। তিনি মানুষকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। তাদের জীবনযুদ্ধ, দারিদ্র্য জীবন, ধনিক আর শাসক শ্রেণীর অত্যাচার, যা কিছু তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তারই সরল প্রতিফলন তাঁর রচনায় আন্তরিক ও আবেগময় ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। আর যুক্তি তর্কের এবং আদর্শশ্রয়ের চেয়ে হৃদয়বৃত্তি সেক্ষেত্রে অতিমাত্রায় সচল হলেও তাঁকে দোষারোপ করা যায় না। ধরে নিতে হবে তাঁর ভাব প্রকাশের এ-ও এক স্টাইল। আর এই স্বতন্ত্র স্টাইলের মধ্যে নজরুলের ব্যক্তিত্ব এবং ভাষার প্রকাশ ঘটেছে স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। তাঁর স্বকল্পিত রাজনৈতিক বক্তব্যও সে সূত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে কাজী আব্দুল ওদুদ Robert Lynd এর 'Literature is journalism that lasts' উক্তিটি তুলে ধরে বলেছেন, 'এই যে শেষের কথা that lasts যা টিকে যায়, এরই মধ্যে রয়েছে সাহিত্যের মূল তত্ত্ব। সাংবাদিকতা স্থায়ী হয় না, কিন্তু সাহিত্য স্থায়ী হয়, এই জন্য যে, সাংবাদিকতা প্রতিদিনের জীবনের মতো অস্থির অপূর্ণাঙ্গ, নিয়ত পরিবর্তনশীল তা যেন প্রতিদিনের জীবনের ফটোগ্রাফ। কিন্তু সাহিত্য ঠিক তা নয়, তা অনেকখানি অচঞ্চল, অনেকখানি পূর্ণাঙ্গ, কেননা, ঠিক বাস্তব লোকে নয় কল্পনা-লোকে অথবা সৌন্দর্য-লোকে তার অধিষ্ঠান।'<sup>৫৬</sup>

নজরুল সাহিত্য স্থায়ী হয়েছে তাঁর ভাষার অন্যমাত্রার এক অনন্য সাধারণ গুণে-সেটা হলো তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব- যা মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়, এই গুণের জন্য। সে যুগে তাঁর মতো গণমানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত আর কোনো কবি বা কথাশিল্পী ছিলেন এমন দৃষ্টান্ত খুব দুর্লভ। সে কারণেই তাঁর বিশাল মাপের হৃদয় মনের পরিচয় সাধারণ জনতাসহ এই প্রজন্মের পাঠকদেরও মোহিত করে। মনে হয় এভাবেই তাঁর ভাষায় ব্যক্তিত্বে প্রকাশ ঘটেছে, পাশাপাশি কথাশিল্পী হিসেবে তাঁর সাকল্য প্রকাশিত হয়েছে।

## ১১. ভাষার নবদিগন্তের সূত্রপাত

নজরুল কথাসাহিত্যে ভাষা এক নতুন মাত্রার অভিযাত্রী। বাঙালির সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন চিত্র, তাঁর নিজের জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাতের সঙ্ঘাত অভিজ্ঞতার প্রায় পুরোটাই এক স্বতন্ত্র আবেগের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। সে আবেগ কোথাও সঙ্গতিহীন মনে হলেও চেতনাপ্রবাহ রীতির অনেকখানি শর্ত পূরণে সক্ষম হয়েছে। চেতনাপ্রবাহ রীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে :

ক. প্রবল আবেগ ব্যঞ্জনার প্রতিফলন

খ. কথক কাহিনীর গতিকে আবেগময় ভাষায় পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে

- গ. এখানে শ্রোতা কোন চরিত্র হতে পারে, আবার পাঠকের উদ্দেশ্যেও কাহিনী বিধৃত হতে পারে। নজরুল শেযোক্ত মাধ্যমকেই নির্বাচন করেছেন
- ঘ. ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব থেকে জীবনের অনাবৃত অনুষ্ণের বিবরণ-বিশ্লেষণ হতে পারে
- ঙ. ব্যক্তি আর সমাজ চিত্রের সঙ্গতিহীন প্রলাপও চেতনাপ্রবাহ রীতির সাহিত্য রচনার একটি মাধ্যম
- চ. স্মৃতিচারণ চেতনাপ্রবাহ রীতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য। নজরুল কথাসাহিত্য সম্পর্কে ইতোপূর্বে প্রায় সব অধ্যায়ের আলোচনায় তাঁর আবেগজড়িত কাহিনী এবং ভাষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ‘চেতনাপ্রবাহে’র অন্যতম বৈশিষ্ট্য আবেগ। নজরুলের ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা প্রলাপের মতো বলেছেন। যেমন ‘বাঁধন হারা’ উপন্যাসের প্রত্যেক পত্র লেখক (নূরুল হুদা, রবিয়ল, মনুয়র, রাবেয়া, মাহবুবা, সোফিয়া, আয়েশা এবং মা) তাদের ভাবোচ্ছ্বাসের কথা লিখে কাহিনীকে সচল করেছে। নূরুল হুদাকে লেখা রাবেয়ার একটি দীর্ঘ চিঠির অংশ বিশেষ এই মূল্যায়নে সমর্থন দেবে।

তোমার সরল অট্টহাস্যে এই ঘর একদিন মুখরিত হ’য়ে উঠেছিল,-গল্পের রহস্যলাপের তোড়ে এই ফাঁকা ঘরকেই তুমি মজলিসের মত সরগরম ক’রে তুলেছিলে-সেই ঘর আজো আছে; তবে তেমনি ফাঁকা! অনবিল ঝর্ণাধারার মত উদ্দাম হাসির ধারায় সে ঘরকে কেউ আর বিবৃত করে না, তাই সে নীরব-নিঝুম এক ধারে পড়ে আছে।<sup>১১</sup>

এ স্মৃতিচারণের অনাবিল আবেগের ভাষা-যা চেতনাপ্রবাহ রীতিকে অনেকটা অনুসরণ করে। তবে বাক্যগুলো নাতিদীর্ঘ - যা চেতনাপ্রবাহের আঙ্গিক সজ্জার সূত্র অনুগামী নয়। ‘বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী’ গল্পটি অনেকটা চেতনাপ্রবাহ রীতির সার্থক রচনা বোধ হয়। এই গল্পে কথক তার শৈশব থেকে পরিণত বয়সের বেদনার্ত স্মৃতিচারণ করেছেন। এ গুলো আকস্মিক উপলব্ধি আর আন্তঃসংলাপেরও বৈশিষ্ট্যযুক্ত। যেমন-

হ্যাঁ, আমার ছোট কালের কথা বিশেষ ইয়াদ হয় না। আর আবছায়া রকমের একটু একটু মনে পড়লেও তাতে তেমন কোন রস বা রোমান্স (বৈচিত্র্য) নেই!-সেই সরকারী রাম-শ্যামের মত পিতামাতার অত্যধিক স্নেহ, পড়ালেখায় নবডঙ্কা, ঝুলঝিপ্পুর ডাঙাগুলি খেলায় ‘দ্বিতীয় নাস্তি; দুষ্টামি-নষ্টামিতে নন্দদুলাল কৃষ্ণের তদানীন্তন অবতার, আর ছেলেদের দলে অপ্রতিহত প্রভাবে আলেবজাভার দিগ্গেটের ক্ষুদ্র সংস্করণ!<sup>১২</sup>

‘রাজবন্দীর চিঠি’ গল্পেও ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী উত্তম পুরুষে পত্রাকারে প্রবল আবেগের ভাষায় রচনা করেছেন। পুরো গল্পটাই প্রলাপ আর উচ্ছ্বাসের ভাষা প্রবাহে নিজের কথা একজন কথকের মতো ব্যক্ত করেছেন। ‘রাস্কুসী’ গল্পেও স্বামী হত্যাকারিনী তার জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করে স্মৃতি থেকে। আত্ম উপলব্ধির এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ লেখক চরিত্রের আত্মকথনকে বর্ণনাকারে উপস্থাপন করেছেন-

## সাহিত্যিকী

এমনি করেই খুব সুখে দিন যাচ্ছিল আমাদের! আমি মনে করতুম, আর য'টা দিন বাঁচি এমনি করেই সোয়ামীর সেবা ক'রে, ছেলে-মেয়ে চরিয়ে, নাতি-পুতি দেখে আমার হাতেরর নোওয়া অক্ষয় রেখে মরি; কিন্তু তা আমার পোড়া বিধাতার সইল না। আমার সাধের ঘরকন্যা শ্যামানপুরী হ'য়ে গেল! আমার এত আশা-ভরসা সব-তাতে চুলোর ছাই-পাঁশ পড়ল!<sup>২৩</sup>

‘শিউলিমালা’ গল্পেও কথক এই স্মৃতিকে আশ্রয় করে তার বার্থ প্রেমের কাহিনী বিবৃত করেছেন। কথকের বর্ণনা কখনো সংলাপকারে পরিবেশিত হয়েছে। শ্রোতা একাধিক ব্যক্তি।

তখন সবেমাত্র ব্যারিষ্টারি পাস করে এসেই ‘শিলং বেড়াতে গেছি। ভাদ্রমাস। তখনো পূজার ছুটিওয়ালার দল এসে ভিড় জমায়নি। তবে আগে থেকেই দু'একজন করে আসতে শুরু করেছেন। ছেলেবেলা থেকেই আমার দাবাখেলার ওপর বড়ো বেশি ঝোক ছিল। ও ঝোক বিলেতে গিয়ে আরো বেশি করে চাপল। সেখানে ইয়েটস, মিচেল, ইউন্টার, টমাস প্রভৃতি সবল নাম করা খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলেছি এবং কেমব্রিজের হয়ে অনেকগুলো খেলা জিতেওছি।’<sup>২৪</sup>

নজরুল কথাসাহিত্যে তাঁর ‘আমিত্ব’ প্রধান হয়ে উঠেছে। তারই প্রকাশ প্রবল আবেগের সঙ্গে ঘটেছে বিভিন্ন অনুসঙ্গে। চেতনাপ্রবাহ রীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য অরোধ্য আবেগ। চেতনা প্রবাহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক জেমস জয়েস (১৮৮২-১৯৪১) তাঁর জন্মভূমি আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন শহরকে খুব ভালোবাসতেন। এ শহর ঘিরে তাঁর শৈশব-কৈশোর আর যৌবনের অজস্র স্মৃতি মনের গহনে উথালি-পাথালি করেছে। তিনি খুব সম্ভব ১৯০৭-১৯০৮ এর মধ্যে তার সেই প্রিয় শহর, শহরের নানা শ্রেণী পেশার মানুষ, এমন কি রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের চারিত্রিক দুর্বলতা নিয়ে লেখাসহ মোট পনেরটি গল্প লিখে গ্রন্থটির নামকরণ করেন ‘ডাবলিনার্স’ (১৯১৪)। এই পনেরটি গল্পেই তাঁর আদম্য আবেগ আর শৈশব-কৈশোরের অমৃত স্মৃতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এই গল্পগ্রন্থে সেই সময়ের আয়ারল্যান্ডের যে নৈতিক অবক্ষয় শুরু হয়েছিলো তার প্রামাণ্য চিত্র-হিসেবে তিনি গল্পগুলোর অবতারণা করেন। ডাবলিনকেই তিনি আয়ারল্যান্ডের নমুনা হিসেবে গল্পে উপস্থাপন করেন। শৈশব-কৈশোর আর যৌবনের স্মৃতিকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সমাজের নানা অসঙ্গতি জয়েস গল্পগুলোয় পরিবেশন করেন। এ-প্রসঙ্গে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ‘আ পোট্রেট অব দ্য আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়ংম্যান’ এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকর্ম ‘ইউলিসিস’-এর কথাও আমরা স্মরণ করতে পারি। স্মৃতি, আবেগ আর নিখাদ ভালোবাসার উজ্জ্বল উচ্চারণ এই দুই উপন্যাসের পাতায় বিধৃত হয়েছে। উপন্যাসের প্রচলিত রচনা শৈলীকে অবজ্ঞা করে বা অনুসরণ না করে জেমস জয়েস এক স্বতন্ত্র ধারায় ব্যক্তিগত অনুভূতি, আবেগ-ভালোবাসার কথা বর্ণনা করেছেন-যার শৈল্পিক বা তাত্ত্বিক নাম চেতনা প্রবাহ। নজরুল কথাসাহিত্যে সে সূত্র আবিষ্কার কতোটা যুক্তিযুক্ত এ বিচার স্বতন্ত্রভাবে করা যেতে পারে। তিনিও চেতনাপ্রবাহ রীতির সাহিত্যদর্শন অবহিত ছিলেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু তাঁর উত্তম পুরুষে রচিত স্মৃতিচারণ, প্রলাপ আবেগের ভাষা চেতনাপ্রবাহ রচনা শৈলী অনুসরণ না করলেও এটাকে নজরুলীয় চেতনাপ্রবাহ বললে ভুল হবে না বোধ হয়?

## নজরুল কথাসাহিত্য : ভাষা বিন্যাসের নবদিগন্ত

তবে প্রসঙ্গত পুনরায় বলা যায়, নজরুল ইসলামও জন্মভূমি আর তাঁর দরিদ্র-নিপীড়িত মানুষদের ভালোবাসতেন। তাঁর এই দেশপ্রেম এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মমত্ববোধ আর দায়িত্ববোধ ছিলো প্রখর এবং শর্তহীন। আবেগ ব্যতীত কারো মধ্যে এ সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্ম হয় না। মানুষ এক কথায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পরাক্রমশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে সংঘাতে অবতীর্ণ হতে পারে না। বৃটিশ দুঃশাসকের সংগঠিত শক্তির বিরুদ্ধে এমন দুর্বীর সাহস নিয়ে পরাধীন ভারতে নজরুল ব্যতীত আর একজন লেখক সম্পাদক কী ছিলেন যিনি অকুতোভয়ে, বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, ‘ধূমকেতু, ভারতের স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ বুঝিনা’..... (অর্ধসপ্তাহিক ধূমকেতু, সম্পাদকঃ কাজী নজরুল ইসলাম, ১৩ অক্টোবর, ১৯২২)। সে জনোই তাঁর সৃষ্ট আনসার (মৃত্যু-ক্ষুধা) অথবা জাহাঙ্গীর (কুহেলিকা) পরিবারিক বিস্ত-বৈভব থাকা সত্ত্বেও সেগুলোকে তুচ্ছ করে দেশের স্বাধীনতার জন্যে সশস্ত্র রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক দরিদ্র-নিপীড়িত মানুষগুলোর। এদের শুধু রাজনৈতিক মুক্তিই আনসার ও জাহাঙ্গীরের লক্ষ্য নয়, আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তিও তাদের সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত। এই রাজনৈতিক সংগ্রামের সমান্তরালে নজরুল শাসক শ্রেণী, দেশের ধনিক-বনিক আর শাসকদের শাসনযন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তি গোষ্ঠীর নিষ্ঠুরতা, নিচতা অন্যায্য অপকর্মের কারণে সামাজিক অবক্ষয়, ব্যক্তিহীন ইত্যাদি তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর কাহিনীর পরতে পরতে। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি, সম্প্রাদায়িকতা সৃষ্টি দুর্নীতি-মিথ্যেচারীতা-সবকিছুর বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী শানিত অস্ত্রের মতো ভূমিকা নিয়েছে। বিপন্ন-পরাধীন দেশবাসীর বুকে শক্তি সঞ্চয় করেছে তাঁর লেখা। এসব রচনা নজরুল নিজস্ব স্টাইলে- অর্থাৎ আবেগময় ভাষায় রচনা করেছেন। এগুলোতেও তাঁর আমিত্ব প্রধান হলেও দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি ভালোবাসায় ছেদ পড়েনি। ‘মৃত্যু-ক্ষুধা’ উপন্যাসে বাইশ পরিচ্ছেদে কৃষ্ণনগরের স্মৃতি চারণ করেছেন-যেখানে একদিন নজরুল সপরিবারে বাস করতেন। সেদিনের স্মৃতি উপন্যাসে যে ভাবে এসেছে-

সেই মাটির পুতুলের কৃষ্ণনগর! সেই পূলা-বাদার চাঁদ-সড়ক! শুধু সড়কই আছে, চাঁদ নেই! সবাই বলে, দুদিনের জন্য চাঁদ উঠেছিল, রাহতে গ্রাস করেছে! ব’লেই আশে-পাশে তাকায়।

সেই ‘ওমান কাতলি’ পাড়া, সেই বাগান, পুকুর, পথ-ঘাট, কোদল-কাজিয়া সব আছে আগেকার মতই। শুধু যারা কিছুতেই তুলতে পারে না তারা ছাড়া আর সকলেই মেজ-বৌ, কুর্শি, প্যাকালে, আনসার-সবাইকে সব কিছুকে তুলে গেছে। স্মরণ রাখার অবকাশ কোথায় এই নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের মাঝে!

অগাধ স্রোতের বিপুল আবর্তে প’ড়ে যে হাবুডুপু ঝেয়েছে, সে-ই জানে কেমন করে আবর্তের মানুষ এক মিনিট আগে হারিয়ে-যাওয়া তারই কোলের শিশু সন্তানের মৃত্যু-কথা তুলে আত্ম-রক্ষার চেষ্টা করে!

## সাহিত্যিকী

নিভাকার একটানা দুঃখ অভাব-বেদনা-মৃত্যুপীড়া অপমানের পঙ্কিল স্রোতে, মারণাবর্ষে যারা ডুবে মরছে, তাদের অববদন কোথায় ক্ষণপূর্বের দুঃখ মনে ক'রে রাখবে? ওরা বেবলি হাত-পা ছুড়ে অসহায়ের মতো আত্মরক্ষা করতেই ব্যস্ত।

বিন্ধু জীবনের সবল আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়ে যে-মৃত্যুর মুখে নিশ্চিন্তে আত্মসমর্পণ করে, এই শেষে নির্ভরতার চরম মুহূর্ত বুঝি-বা তার স্মরণ পথে ভিড় করে আসে। সেই চলে যাওয়ার দল। যারা সারা জীবন তারই আগে-পিছে তার প্রিয়তম সহযাত্রী ছিল<sup>১১</sup>

‘কুহেলিকা’ উপন্যাসের নায়ক জাহাঙ্গীর তার পিতা-মাতার অবৈধ সন্তান। তার কাছে সামাজিক বিচারে নিজের জন্ম বৃত্তান্তটি অত্যন্ত আত্মসম্মান হানিকর এবং লজ্জাজনক আর অপবিত্রও। সে কথা জানা পর জাহাঙ্গীর তার রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু প্রমত্তের কাছে ছুটে এসেছে। ভীষণ অভিমান আর আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেছে-

আমি এ পবিত্র ব্রত নিতে পারিনা প্রমত্তদা। না জেনে নিয়েছিলাম,  
তার জন্য যা শান্তি দেবেন দিন। আমার রক্ত অপবিত্র আমি জারজ পুত্র।<sup>১২</sup>

প্রমত্ত তাকে গভীর স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেয়। বলে, তার জন্মের জন্য সে দায়ী নয়। এতে তার লজ্জার কি। সে আর দশজনের মতোই একজন পবিত্র ও সম্পূর্ণ মানুষ। সে-ও দেশের সেবক হতে পারে। তার শৃঙ্খল ভাঙার সংগ্রামে অংশ নিতে পারে। তারপর নজরুল জাহাঙ্গীরের মানসিক অবস্থার বর্ণনা দেন এভাবে-

সে খাড়া হইয়া বসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল-“সত্যি বলছেন প্রমত্তদা? আমি তাহলে নিষ্পাপ? পিতার লাশসা, মাতার পাপ আমার রক্ত কলুষিত করেনি? করেছে, করেছে। আজ আমি তার পরিচয় পেয়েছি। দেখুন প্রমত্তদা আমি জীবনে কখনো বুঝখা উচ্চারণ করিনি, বিন্ধু আজ আমি এক নারীকে পিতার রক্ষিতা বলে গালি দিয়ে আপনার রসনা কলঙ্কিত করেছি;- সে নারী আমারই জন্মদাত্রী।...”<sup>১৩</sup>

‘ব্যথারদান’ গল্পে এই আবেগ আরো জমাট বাধা। যেমন-

পুরানো কত স্মৃতিই আজ আমার বুক ছেপে উঠেছে! সেই গোলেতানে এক জোড়া বুলবুলেরই মত মিলনেই অভিমান, মিলনেই বিচ্ছেদ-ব্যথা আর তারই প্রগাঢ় আনন্দে অজস্র অশ্রুপাত! তার চিন্তাটাও কত ব্যথিত বিধুর! তারপর সেই জুয়াচোরের জোর ক'রে আমায় ছিনিয়ে- নেওয়া দয়িতের বুক থেকে,-অনেক কষ্টে তার হাত এড়িয়ে প্রিয়ের অন্বেষণ!- ওঃকি-ই না রু'রেছে তাকে আবার পেতে! কই তখনও তো সে এল না!<sup>১৪</sup>

নজরুল ইসলাম হয়তো কথাসাহিত্যের ‘চেতনাপ্রবাহ’ রীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। আজকের প্রজন্মের গবেষকেরা তাঁর আবেগ, স্মৃতিচারণ, কাহিনী ইত্যাদি পরিবেশক হিসেবে তাঁর নিজের উপস্থিতি, ইত্যাদি বিষয়কে চেতনাপ্রবাহ রীতির খন্ড খন্ড বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে। ভাষার সৌন্দর্য্য সে কথাকেই সমর্থন করে।

### নজরুল কথাসাহিত্য : ভাষা বিন্যাসের নবদিগন্ত

জাহাঙ্গীর ক্ষীণ চন্দ্রলোককেও দেখিতে পাইল, সভ্যসভ্যই আঙুলটা নীল হইয়া উঠিয়াছে। সে ভূমীর হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল। তহমিনা পুষকে, আবেগে জাহাঙ্গীরের কেন্দ্রে চলিয়া পড়িল। জাহাঙ্গীর আত্ম দিশা হারাইল। সুতীর্ণ আবেগে সে তহমিনাকে চুম্বন করিল। তহমিনা সুখে, লক্ষ্যায় উত্তেজনায় শিখিল-ভনু শিখিল-বসন হইয়া পড়িল। সে কিছুতেই যেন নিজেকে সংবরণ করিতে পারিতেছিলনা। মনে হইল তাহার নড়িবার শক্তিটুকু পর্যন্ত কে হরণ করিয়া লইয়াছে। সে শুধু তাহার দুই বাহু দিয়া প্রাণপণ শক্তিতে জাহাঙ্গীরের কণ্ঠ জড়াইয়া দুই একবার অঙ্গুষ্ঠ মিনতি করিল।

দেবরুমার একমুহূর্তে রক্ত লোলুপ পশু হইয়া উঠিল। কোথা হইতে যেন কি ঘটিয়া গেল। তহমিনা কাদিয়া বলিয়া উঠিল: “তুমি একী করলে?”

জাহাঙ্গীর কোনো উত্তর না দিয়া মাতালের মতো টলিতে টলিতে চলিয়া গেল।<sup>১৭</sup>

এইটুকু ফ্রেয়ডীয় তত্ত্বের সার্থক বর্ণনা। নির্জন রাতে নারী-পুরুষ একত্রিত হলে যে ঘটনা ঘটে, তার বাস্তব দিকের ইঙ্গিতময় বর্ণনা। চেতনাপ্রবাহ রীতির কথা সাহিত্যে আত্মোপলব্ধির বিষয়টিও যুক্ত থাকে। ‘কুহেলিকা’র জাহাঙ্গীরের ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় ঘটেনি। আবেগঘন কর্মকাণ্ড এবং কথাবার্তার পর যে উপলব্ধি মানুষের মনে সহজাত খুব স্বাভাবিকভাবেই জাগতে পারে, নজরুল সেই বাস্তব দিকটাকেও আবেগবর্জিতভাবেই পরিবেশন করেছেন।

এ কি করিল সে। পক্ষজ হইলেও নিজেকে পক্ষের উর্ধ্ব শতদলের মতো তুলিয়া ধরিবার তপস্যা সে করিতেছিল। তাহার সে স্বদেশ-মন্ত্রের পবিত্র অগ্নিতে আত্মগুহি হইয়া গিয়াছে! স্বর্গে আরোহণ করিতে করিতে এ কোন্ রসাতলে সে পতিত হইল! অনুতাপে অনুশোচনায় তাহার আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা করিতে লাগিল! কিন্তু একী! একমুহূর্তে সে যেন অতি বড় কাপুরুষ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার এখন মৃত্যুকে ভয় করিতেছে। আর সে অসঙ্কোচ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইতে পারে না। সে তো তহমিনার সর্বনাশ করে নাই, সর্বনাশ করিয়াছে সে নিজের।

জাহাঙ্গীর মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া অসহায় শিশুর মতন রোদন করিতে লাগিল।<sup>১৮</sup>

নজরুল রচিত ‘চেতনাপ্রবাহ’ রীতির ভাষা সরল এবং অলঙ্কারহীন। এই ভাষায় আবেগ স্মৃতি আর আত্মোপলব্ধি বহুমাত্রিক হিসেবে যুক্ত হয়েছে। তাঁর আত্ম-বিশ্লেষণ, দেশ ও দেশবাসীর প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা এবং সচেতনভাবে একই সঙ্গে দেশপ্রেমিক আর মানব প্রেমিকের বিষয়টিকে বিচেনায় রেখে মূল্যায়ন করতে হবে। গভীর আবেগ ব্যতীত একব্যাক্য কেউ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে আত্মনিয়োগ করতেপারেন না, সাহসও অর্জন করা সম্ভব হয় না। নজরুলের আবেগ চেতনাকে সচল করে, মানুষের প্রতি মমত্ব ও দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করে! এই বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তিনি আবেগময় ভাষা সৃষ্টি করেছেন-যা একান্ত তাঁরই। নজরুলের চেতনাপ্রবাহ রীতির ভাষা আবেগ, আত্মবিশ্লেষণ আর আত্মসংলাপ, কল্পনা, অনুমান গুণে শিল্পরসে সঞ্জীবিত হয়েছে। তাই তাঁর চেতনাপ্রবাহ রীতি এবং তাঁর ভাষা শুধু সাহিত্য নয়, ব্যক্তি আর সমাজবাসীর নতুনতর বোধোদয়েরও বিশ্বস্ত সোপান হয়ে আছে।

## ১২. শেষকথা

নজরুল ইসলামের জীবনের অভিজ্ঞতা বিস্তর; তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও ছিলো প্রগতিশীল। কিন্তু শৈল্পীক চেতনা ছিলো আবেগময়, যার পরিণতি কখনো স্ববিরোধী ফলশ্রুতি দৃষ্ট, আবার কখনো মানবতাবাদী চেতনায় সমুজ্জ্বল। অথচ যথার্থ-শিল্প পরিকল্পনার অভাবে সমালোচকদের কাছে তাঁর কথাসাহিত্যের সম্ভার প্রায় অনালোচিত বিষয়ের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬) বলেছেন, 'শিল্পের জন্য বুদ্ধির দরকার। নজরুল ইসলামের রচনায় ছাটাই বাছাই কম। বুদ্ধিকে তিনি দস্তুর মতো ভয় করতেন।'<sup>৬৭</sup>

আবু সয়ীদ আইয়ুবও নজরুলের রচনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'সাহিত্যের দুটো কাজ Expression of life জীবনের প্রকাশ, আর Criticism of life জীবনের সমালোচনা-নজরুলের রচনা প্রথমটির সদ্ভাব থাকলেও, দ্বিতীয়টির অসদ্ভাব।'<sup>৬৮</sup>

এ-ভাবে অনেকেই নজরুলের সাহিত্য এবং ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি নিজেও সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। 'মানবদরদী ও দেশপ্রেমিক নজরুল অপেক্ষা শিল্পী নজরুল দুর্বল। তাঁর চারিত্রিক অস্থিরতা এবং সাংসারিক জীবনে অনিশ্চয়তা অনেকখানি দায়ী সন্দেহ নেই। আর্থিক প্রয়োজনে দ্রুত গতিতে লিখতে হয়েছে তাঁকে। কোন রচনার পরিবর্তন ও পরিমার্জনা করা তাঁর পক্ষে প্রায়ই সম্ভব হয়ে উঠতো না।'<sup>৬৯</sup>

নজরুলের কথাসাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে এ ধরনের ট্রাডিশনাল বক্তব্যই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এর সঙ্গে সংযুক্ত দেখা যায়, নজরুল গরিব ছিলেন, লেখাপড়া বিশেষ জানতেন না বা শিখতে পারেননি, টাকার জন্য তাঁকে লিখতে হয়েছে, বন্ধুঘরে পান খেয়ে গান গেয়ে লিখতে হয়েছে, লেখার পরিচর্যা করতে পারেননি ইত্যাদি। ফলে নজরুল সাহিত্যের শিল্প রচনা ক্ষেত্রে শিল্পীর ব্যক্তি জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে বক্তব্য উত্থাপন করা হয়েছে। শিল্প রচনা ক্ষেত্রে শিল্পীর ব্যক্তি জীবনের প্রভাব থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয় কিন্তু তাকে মূলধন করে শিল্পকে পর্যালোচনা করা বিজ্ঞান সম্মত নয়। শিল্পকে প্রধানত শিল্প হিসেবে দেখাই শ্রেয়। এ ক্ষেত্রে কে দরিদ্র আর কে জমিদার বিবেচ্য নয়। সময়ভাব বা পাণ্ডিত্যও বড় মাপকাঠি নয়। মোহিতলাল মজুমদার সুপণ্ডিত ও ব্যাকরণবিদ ছিলেন। তাঁর সময়ভাবও ছিল না, এমন কি নজরুলের মত দরিদ্রও ছিলেন না; তাহলে তিনি কেনো তাঁর কবিতায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি বলে সমালোচকেরা অভিযোগ করেন!

প্রকৃত পক্ষে, সাধারণ ভাষার মাপকাঠি দিয়ে সাহিত্যের ভাষা বিবেচনা সমীচীন নয়। সাহিত্যের ভাষা সাধারণ ভাষা থেকে কিছুটা উচ্চাবস্থিত। ব্যাকরণগত দিক থেকে অনেক সময় সাহিত্যের ভাষা অব্যাকরণগত ভাবে বিন্যস্ত মনে হতে পারে। এক্ষেত্রে সরাসরি ব্যাকরণ প্রয়োগ না করে সাহিত্যিক ব্যাকরণ অনুধাবন করতে হবে। শরৎ- চন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে একটি বাক্য এ প্রসঙ্গে লক্ষ করা যেতে পারে-

‘রাজলক্ষ্মী ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, আমার মাথা খাবে ঠাকুরপো যদি ওঠো।  
রাজলক্ষ্মীর এই বক্তব্য অব্যাকরণগত। এখানে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর মাথা  
একীভূত করা হয়েছে-যা কখনই খাওয়া ক্রিয়াপদ গ্রহণ করতে পারে না। বিস্তৃত সাহিত্যের  
ভাষা হিসেবে এই ভাষায় কোন অশুদ্ধি বা দুর্বলতা নেই।

নজরুলের ভাষাও সাহিত্যের ভাষা। প্রচলিত সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ দিয়ে এর  
ব্যাখ্যা করতে গেলে ভুল করা হবে। যেমন নজরুলের গদ্য দুর্বল, প্রাঞ্জল নয়, স্বকন্ঠকে  
তকতকে নয়, ভাবাবেগ প্রধান, অযৌক্তিকভাবে বিন্যস্ত ইত্যাদির কারণে শিল্পমান ক্ষুণ্ণ  
হয়েছে-এ ধরনের মন্তব্য অনেকেই করেছেন। এর কারণ হিসেবে তাঁর শিক্ষা, দারিদ্র  
জীবন-এ সব ব্যাখ্যাও তাঁরা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর গদ্য নিয়ে যথাযথ বিচার বিশ্লেষণ  
করার পূর্বেই তাঁকে অপাংক্তেয় ঘোষণা করা কতোটা যুক্তি ও বিবেচনা সম্পন্ন হয়েছে  
সেকথাটাও ভেবে দেখতে হবে। নজরুলের চিন্তা-চেতনার স্বরূপের পরিচয় না নিয়ে এই  
ধরনের সিদ্ধান্তগ্রহণ বোধ হয় সমালোচনা রীতিবিরুদ্ধ! সে কারণেই নজরুলের ব্যক্তি  
জীবনের সঙ্গে তাঁর গদ্য সম্পর্কে যারা বিরূপ সমালোচনা করেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে  
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়ঃ

‘দেখা হয় নাই চক্ষুমেলিয়া/ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া/একটি ধানের শিষের  
উপরে/একটি শিশির বিন্দু’,-একটি শিশির বিন্দু’র অন্তর সম্পদ ভিত্তিক তার সমুজ্জ্বল  
অনিবার্য রূপ। শৈল্পিক প্রভা। নজরুলের সাহিত্যভাষা তাঁরই চেতনা সমৃদ্ধ শৈল্পিক ভাষা।  
এই ভাষায় তাঁর সাহিত্য বক্তব্য উদ্ভাসিত। তিনি যা নিয়ে সাহিত্য করতে চেয়েছেন, যা  
বলতে চেয়েছেন-সবই এ-ভাষা ছাড়া সম্ভব ছিলনা। তিনি ‘ছাগল’ জাতীয় লেখক ছিলেন  
না, ছিলেন প্রতিভাবান ‘পাগল’ শ্রেণীর লেখক। তাঁকে আজীবন সময় দিলেও তিনি  
ভিন্নধর্মী রচনা তৈরি করতে পারতেন না। কারণ, এটাই তাঁর স্টাইল। এবং তাঁর ভাষাই  
তাঁর স্টাইলের স্বতন্ত্র সম্পদ।

স্টাইল- উপর থেকে আরোপিত কোন বস্তু নয়। প্রচলিত লেখাপড়া জানলেই যে স্টাইল  
অর্জন সম্ভব-তা কিন্তু নয়। এটা লেখক সজ্ঞাত একটা বিশেষ কিছু, যা পাঠকেরও অন্তরে  
একটা বিশেষ উপলব্ধি সৃষ্টি করে। এবং এই উপলব্ধি যখন একজনের লেখা থেকে  
অন্যজনের পার্থক্য সৃষ্টি করে, তখন দুজনের স্টাইল আলাদা হিসেবে ধারণা দেয়। এ  
কারণে রবীন্দ্র যুগে নজরুল স্বতন্ত্র এক স্টাইলের অধিকারী। যদি এই স্টাইল সৃষ্টিতে  
নজরুল সার্থক হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই তাঁর ভাষা শৈল্পিক গুণ সম্বলিত স্বতন্ত্র ভাষা-  
যা একান্ত তাঁরই।

নজরুল

২৪১

বিন্যাস

## সাহিত্যিকী

তবে এই ভাষা কেবলমাত্র সাধারণ ভাষা নয়, তাঁর চিন্তা-চেতনার সার্বিক বাহন এবং ভাবপ্রকাশক। নজরুলের বিশেষ ধরনের চেতনাপ্রভাবের অভিব্যক্তি মূলক এক সাহিত্যের ভাষা। তাঁর চিন্তা-চেতনার প্রবহমানতায় সমৃদ্ধ কালের প্রেক্ষিতে আমরা ঠিকমত উপস্থাপিত করতে পারিনি। যদি তার সঠিক মূল্যায়ন করা যেত, তাহলে ট্রাডিশনাল বক্তব্যের আবর্তে আমাদের ঘুরপাক খেতে হত না।

দেশ ও মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও মমত্ববোধে উৎসারিত ভাষা বিন্যাসের নতুন আয়োজন সম্পর্কে আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে। পরাধীন দেশের মানুষের শৃঙ্খলিত দুঃসহ জীবনচিত্র এক স্বতন্ত্র ভাষায় নজরুলের মতো আর কোন কবি-সাহিত্যিক একেছেন-এমন দৃষ্টান্ত খুব দুর্লভ। সংস্কারবাদী নেতার মতো পুরাতন ধ্যান ধারণার মূলে প্রবল শক্তিতে আঘাত করে সে সময় সাহিত্যে নতুন ধারা সৃষ্টির অগ্রপথিক নজরুল, এ কথা মনে করতে বেশি বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। তাঁর মতো এমন নিঃশঙ্ক চিন্তের অধিকারী আর ক'জন খুঁজে পাওয়া যায়? কার জীবন এতে বিচিত্র আর দ্বন্দ্ব সংঘাতময় ছিলো? আমরা জানি, যুদ্ধ নিয়ে কথাসাহিত্য রচনা তাঁর সমকালে অনুপস্থিত। তেমনি অনুপস্থিত বিদ্রোহের ভাষা, স্বাধীনতা আদায়ের লক্ষ্যে রচিত সংগ্রামী ভাষা। তাই, এই দিকগুলোর প্রতি লক্ষ রেখেই তাঁর কথাসাহিত্যের ভাষাবিচার করা প্রয়োজন। তাঁর কালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ভারতব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রাম আর রুশ বিপ্লব (১৯১৭) এর নতুন সতেজ হাওয়া ভারতবাসিকে আলোড়নিত করেছিলো। নজরুলের মতো আপোষহীন সাহসী, দেশপ্রেমিক এই সব অরোধ্য প্রভাব; থেকে মুক্ত থাকতে পারেননি; নিছক অলসের মতো ঘরের কোণে বসে কাব্য চর্চা করতে পারেননি বলে তিনি যেমন সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন, আবার সাহিত্যেও তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। আবেগ না থাকলে দেশ প্রেমিক হওয়া যায় না। শিল্প ও সৃষ্টি হয়না। আবেগই নজরুলকে শিল্প সৃষ্টিতে সহায়তা দান করেছে-এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

তাই বলা যায়, অবৈজ্ঞানিক অদৃষ্টবাদ পরকাল পুরোহিততন্ত্র প্রভৃতি প্রাচীন প্রত্যয়গুলো তাঁর সময়ই হয়ে এল শিথিল এবং নিষ্ক্রিয়। ডারউইনের বিবর্তনবাদ, মার্কসের বস্তুবাদ, সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা, পুঁথ-বাকুনি প্রমুখ নৈরাজ্যবাদীর রেষ্ট্রনীতিতে অনাস্থা মানব মনের শতাব্দিপুষ্ট বিশ্বাসে ঘুন ধরিয়ে দিল। বাংলাদেশের যুবমানসে এই নতুন যুগের সতেজ হাওয়া নিবিড়ভাবেই লেগেছিলো। সেই যুগের অনেক কবি শিল্পীর অন্তরে রবীন্দ্র মোহজাল থেকে মুক্তির পথ সন্ধান করছিলেন।

“রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছেটা জেগে উঠেছে, কিন্তু অন্য পথ ঠিক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যেন একটা আলো-আধারি সময় যখন নতুনের ঝিলিক দিচ্ছে জানালায়, অথচ ঘরের মধ্যে জড়ো হয়ে আছে পুরানো আসবাবপত্র, ভারি, অনড়, মমতাময় অভ্যাস”-এই আলো আধারির যুগে বুদ্ধদেব বসুর মতে-

## নজরুল কথাসাহিত্য : ভাষা বিন্যাসের নবদিগন্ত

“সব ক’টা জানালা খুলে নতুনের হাওয়া প্রথম যিনি সবেগে বইয়ে দিলেন, তিনি নজরুল।” (বালের পুতুল) <sup>৭০</sup>

এখানেই নজরুলের কথাসাহিত্যের ভাষা শক্তির গতি আবহমান বাঙালিচিহ্নে আন্দোলিত করে। মনে হয়, এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর কথাসাহিত্যের সামগ্রিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাঁর শিল্প-ভাষা বিচার সবই তাঁরই মানস বিচারে করতে হবে। তবেই শিল্পী নজরুলকে প্রত্যক্ষ করতে সুবিধে হবে।

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সমকালে কথাসাহিত্যেও বাঙালি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বোধ হয় সেটা তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রকাশের কারণেই অনেকটা সম্ভব হয়েছিলো। তাঁর ব্যক্তিত্বে আমরা লক্ষ করেছি যুক্তি-দর্শন প্রতিষ্ঠার চেয়ে আবেগ-আত্মমুক্ততা আর অভিমানের নিরলস কথকতা প্রচারের আধিক্য, যা তাঁর চেতনার সাথে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। সে কারণেই উল্লেখ করা যায় যে, ‘লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে উপন্যাসের ভাষা আলোচনা অসম্ভব।’ <sup>৭১</sup> নজরুল কথাসাহিত্যের ভাষা বিচারে এ বিষয়টিও বিবেচনার দাবী রাখে।

সাহিত্যের ভাষারীতির নানা অনুষ্ণের মধ্যে আবেগ-আত্মমুক্ততা ইত্যাদি অন্যতম। নজরুলের মধ্যে সেগুলোর প্রকট উপস্থিতি ছিলো বলে আমরা বলতে পারি ‘a good way of expressing oneself- যা তাঁর চৈতন্যের অন্যতম সম্পদ। একই সঙ্গে আরো বলা যায়, Personality clothed in words- এই উক্তিতে লুবাস বলতে চান স্টাইল লেখকের এক ব্যক্তিত্ব যা একান্তই বস্তুধর্মী। ব্যক্তির বাগভগ্নী বিশেষ শব্দ ও ভাষাকে আশ্রয় করে। সাহিত্যে এই বিশেষ গুণই স্টাইল’ <sup>৭২</sup> এবং তাঁর এই স্টাইল এক নতুন দিগন্তের সূত্রপাতে সমুজ্জ্বল। ‘Style is the man himself’- বুকের এই জগত বিখ্যাত উক্তি অনেকে সাহিত্যের রীতি ও ভাষা বিচারে ব্যবহার করেছেন। আমরা কাজী নজরুল ইসলামের কথাসাহিত্যের ভাষা বিচারে এই কথাটি বিবেচনায় রেখে বলতে পারি, অজ্ঞতা-অনবধানতা ইত্যাদি থাকার কারণে তাঁর কথাসাহিত্যে শিল্পগুণের ঘাটতি থাকলেও তিনি আত্মপ্রচার অভিমান আত্মমুক্ততার সঙ্গে মানুষকে ভালোবাসা, দেশের মুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণাসহ সেই সাহসীকর্মে অংশগ্রহণ আর লেখার মাধ্যমে শৃঙ্খলিত জাতির বুকে সাহস সঞ্চার করার ভাষা অবশ্যই পরাধীন ভারতের সাহিত্যে বিরল দৃষ্টান্ত। নজরুলের এই ভাষাই তাঁকে স্বাভাব্য করেছে। এই ভাষাই সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থানে তাঁকে অধিষ্ঠিত করেছে বলে মনে হয়।

## সাহিত্যিকী

### সহায়ক গ্রন্থ ৪

১. মিহির সেন, ছোটগল্পে নজরুল, নজরুল স্মৃতি, সম্পাদকঃ বিশ্বনাথ দে, সাহিত্যম, নতুন সংস্করণ ০১ বৈশাখ ১৩৭৮, কলকাতা, পৃ. ১৩৪
২. 'সর্বপ্রথম 'ধুমকেতু' ভারতের স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ বুঝিনা'...অর্ধসাপ্তাহিক ধুমকেতু, সম্পাদকঃ কাজী নজরুল ইসলাম, ১৩ অক্টোবর ১৯২২, কলকাতা।
৩. আব্দুল কাদির সম্পাদিত নজরুল রচনাবলী, (নর) ১ম খণ্ড, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৩৭৩, ঢাকা, পৃ. ৭৪০
৪. মোজাফ্ফর আহমদ, কাজী ইসলাম স্মৃতিকথা, ১ম প্রকাশ ১৯৬৫, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি কলকাতা, পৃ. ১৭২
৫. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, দ্বিতীয় ভূবন, প্রবন্ধঃ নজরুল ইসলামের গদ্যরচনা, বাংলা একাডেমী-১৩৮০, ঢাকা, পৃ. ১৬২
৬. ঐ, পৃ. ১৬৪
৭. আতোয়ার রহমান, প্রবন্ধঃ কথাসিঁদ্বী নজরুল, নজরুল সাহিত্য, সম্পাদকঃ মীর আবুল হোসেন, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ২য় সংস্করণ-১৩৭২, ঢাকা, পৃ. ১৫৬
৮. আব্দুল হক, প্রবন্ধঃ নজরুলের গল্প ও উপন্যাস, ঐ পৃ. ১৮০
৯. ঐ, পৃ. ১৮১
১০. নর- ১ম খণ্ড, ঐ, গল্পঃ ব্যথার দান, ঐ, পৃ. ৩৫৭
১১. গল্পঃ বাঁধনহারী, নর ১ম খণ্ড, ঐ, পৃ. ৪৯১
১২. মৃত্যুক্ষুধা, শ্রেষ্ঠ নজরুল রচনাবলীর (শ্রেনর) প্রকাশিত-অপ্রকাশিত সংকলন, আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত ও সংকলিত, প্রতীক প্রকাশন সংস্থা, বইমেলা-১৯৯৬, ঢাকা, পৃ. ৪৩৪
১৩. রক্তের বেদন, নর ১১ম খণ্ড, ঐ পৃ. ৪১১
১৪. ঘুমের ঘোরে, ঐ পৃ. ৩৭২
১৫. রাজবন্দীর চিঠি, ঐ, পৃ. ৩৯৪-৩৯৫
১৬. পূজারিণী, কাব্যঃ দোলন-চাঁপা, নর, ঐ, পৃ. ১৪৫
১৭. হেনা, নর, ঐ, পৃ. ৩৫৮
১৮. মৃত্যুক্ষুধা, শ্রেনর, ঐ, পৃ. ৩৮৮
১৯. কুহেলিকা, নজরুল শ্রেষ্ঠ সংকলন, (নশ্রেস), সম্পাদকঃ বন্যাপী কাজী, কলকাতা, ও প্রফেসর রফিকুল ইসলাম (বাংলাদেশ), সাহিত্য, দ্বিতীয় প্রকাশ-২৯ শ্রাবণ-১৪০৫, কলকাতা, পৃ. ১৪২
২০. ঐ, পৃ. ১৪৯
২১. বুদ্ধদেব বসু, প্রবন্ধঃ নজরুল ইসলাম, সম্পাদক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১ম প্রকাশ-১৯৬৯, ঢাকা, পৃ. ১৯৬
২২. স্বপন চক্রবর্তী, নজরুল ও উপনিবেশের আধুনিকতা, পাকিস্তান দেশ, সম্পাদকঃ অমিতাভ চৌধুরী, ৬৬ বর্ষ ১৬ সংখ্যা, ১২ জুন ১৯৯৯, কলকাতা, পৃ. ৪০

নজরুল কথাসাহিত্য : ভাষা বিন্যাসের নবদিগন্ত

২৩. আবুল ফজল, বিদ্রোহী কবি নজরুল, নওরোজ কিতাবিস্তান, ৪র্থ সংস্করণ-১৯৭১, ঢাকা, পৃ. ৭২
২৪. আব্দুল মান্নান সৈয়দ, নজরুল ইসলাম, কালজ কালোত্তর, বাংলাএকাডেমী, ১ম প্রকাশ-১৯৮৭, ঢাকা, পৃ. ১৪১
২৫. আতোয়ার রহমান, ঐ, পৃ. ৩০৫
২৬. আহমদ শরীফ, প্রবন্ধ: নজরুল সমীক্ষা: অন্য নিরিখে, নজরুল সাহিত্য, সম্পাদক: মীর আবুল হোসেন, ঐ, পৃ. ১৩৬
২৭. মৃত্যুকুধা, ঐ, পৃ. ৩৬৮
২৮. মৃত্যুকুধা, ঐ, পৃ. ৩৯০
২৯. কুহেলিকা, ঐ, পৃ. ১৬৬
৩০. ঐ, পৃ. ১৫৫-৫৬
৩১. ঐ, পৃ. ১৫৫-৫৬
৩২. বাঁধন হারা, নর ১ম খন্ড, ঐ এ পৃ. ৫০৭
৩৩. রাঙ্কুসী, শ্রেনর, পৃ. ২৬৯
৩৪. জিনের বাদশা, শ্রেনর, পৃ. ৩৪৯
৩৫. বাদল-বরিষণে, নর-১ম খন্ড, ঐ, পৃ. ৩৬১
৩৬. কুহেলিকা, ঐ, পৃ. ১৭১-৭২
৩৭. মৃত্যুকুধা, ঐ, পৃ. ৪২১
৩৮. শিউলিমালা, শ্রেনর, ঐ, পৃ. ৩৫৬-৫৭
৩৯. দূরন্ত-পথিক, নর ১ম খন্ড, ঐ, পৃ. ৪৮৩
৪০. বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী, নর ১ম খন্ড, ঐ, পৃ. ৪৩০
৪১. বাঁধন হারা, নর ১ম খন্ড, ঐ, পৃ. ৪৯৭
৪২. মৃত্যুকুধা, ঐ, পৃ. ৩৯৮
৪৩. ব্যথার দান, শ্রেনর, ঐ, পৃ. ৩৫৩
৪৪. স্বামীহারা, নর-১ম খন্ড, ঐ, পৃ. ৪৬৯
৪৫. সাঁঝের তারা, নর ১ম খন্ড, ঐ, পৃ. ৪৪৯
৪৬. কুহেলিকা, ঐ, পৃ. ১৫৪
৪৭. ঐ, পৃ. ১১৬
৪৮. মৃত্যুকুধা, ঐ, পৃ. ৩৯৯
৪৯. কুহেলিকা, ঐ, পৃ. ১৩৮
৫০. কুহেলিকা, ঐ, পৃ. ১৩৮
৫১. ব্যথার দান, শ্রেনর, ঐ, পৃ. ৩৩১
৫২. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ২য় সংস্করণ ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০(১৯৬১), ঢাকা, পৃ. ১৯১
৫৩. মৃত্যুকুধা, ঐ, পৃ. ৪১৪

## সাহিত্যিকী

৫৪. কুহেলিকা, ঐ, পৃ. ১৭৯
৫৫. কুহেলিকা, ঐ, পৃ. ১৯০
৫৬. কাজী আব্দুল ওদুদ, শাস্ত্রত বঙ্গ, ব্রাক প্রকাশনা, ২য় সংস্করণ ১৯৮৩, ঢাকা, পৃ. ৮৪
৫৭. বাধনহারা, নর ১ম খণ্ড, ঐ, পৃ. ৫১১
৫৮. বাউডেলের আত্মকাহিনী, ঐ পৃ. ৪২৭
৫৯. রাস্কুসী, ঐ, পৃ. ৪৫৭
৬০. শিউলিমালা, নশের, ঐ, পৃ. ৩৫৭
৬১. মৃত্যু-সুখ, নশের, ঐ, পৃ. ৯৪
৬২. কুহেলিকা, ঐ পৃ. ১৩১
৬৩. ঐ
৬৪. ব্যথারদান, নর ১ম ঐ, পৃ. ৩৩৭
৬৫. কুহেলিকা, নশের, পৃ. ১৭৬
৬৬. ঐ, পৃ. ১৭৭
৬৭. মোতাহের হোসেন চৌধুরী, প্রবন্ধঃ বগজী নজরুল ইসলাম, পাক্ষিক শৈলী, সম্পাদকঃ বায়সুল হক, বর্ষ ৫, সংখ্যা, ৭,০২, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬, ঢাকা, পৃ. ১০
৬৮. আবু সয়ীদ আইয়ুব এর এই উক্তি মোতাহের হোসেন চৌধুরী 'বগজী নজরুল ইসলাম' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, পাক্ষিক শৈলী, ঐ, পৃ. ১০
৬৯. আতাউর রহমান, কবি নজরুল, ১ম খণ্ড, শুভা প্রকাশনী, ১৯৬৮, ঢাকা, পৃ. ২৫
৭০. ঐ, পৃ. ২৫
৭১. অমিয়ভূষণ মজুমদার ও অসীম রায়, উপন্যাসের ভাষা, বাংলা গদ্য জিজ্ঞাসা, সম্পাদক : অরুণকুমার বসু, সমতট প্রকাশন, কলকাতা, ৩য় মুদ্রণ-১৯৯২, পৃ. ১৬০
৭২. প্রণয়কুমার কুন্তু, রীতি থেকে রীতিবিজ্ঞান, বাংলা গদ্য জিজ্ঞাসা, ঐ, পৃ. ৩৪
৭৩. ঐ, পৃ. ৩২
৭৪. পবিত্র সরকার, বাংলা গদ্যঃ রীতিগত অনুধাবন, ঐ, পৃ. ৬২